দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধিসাধ্য বাস্তব নিষ্ঠ জীবন সমস্যার প্রাধান্য

১. ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৬১)

২. দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭ - ১৯৮০)

৩. শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪ - জীবিত)

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবনিষ্ঠ জীবন সমস্যার প্রাধান্য ।

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১ খ্রীঃ)

১. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজ-পত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে । ঐ বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা বাঙালীর জীবনকে আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল । বাঙালীর মনের উপর নানা সুদূর প্রসারী গূঢ় সঞ্চারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হইল লর্ড কার্জনের বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত করিবার পরিকল্পনা । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১২) বাঙালীর তন্দ্রান্ত জীবনে মর্মভেদী চেতনা-উন্মুখ অধ্যায়ের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল । বাঙালী ঐক্যবদ্ধ জাতি রুখে গর্জিয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল । এই 'স্বদেশী আন্দোলন' সহিংস ছিল না । বাঙলা দেশের সর্বত্র সর্বশ্রেণীর মানুষের 'চিত্তক্ষেত্রে নব ভাবের প্লাবন' আসিয়াছিল — বাঙালী আবেগপ্রবণ জাতি বলিয়াই হয়ত ইহা সম্ভব হইয়াছিল । বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রহিত হইল — আর বাঙালীর 'ভাবপ্লাবনে' ভাঁটার টান পড়িল । রবীন্দ্রনাথের এই পর্বে (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) একটি রচনার অংশ — "বাংলাদেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডাকিল ; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড় ছাপাইয়া পড়ে আর-কি । সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নাড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল । .... সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে । সমাজে মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে ।"[১] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ইহাতে সন্দেহ নাই । 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবিগুরু 'তারুণ্যের' জয় ঘোষণা করিয়া 'সনাতন' সমাজ-ব্যবস্থায় স্থবিরতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন — সেই বাণীই 'হালদার গোষ্ঠী' ছোট গল্পেও স্পষ্ট । 'তারুণ্য' ও 'দেশের নব-যৌবনকে' বীরবলের 'সবুজ-পত্র (১৯১৪ খ্রীঃ) সাগ্রহে জয়-যুক্ত করিয়া

তুলিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 'সবুজ-পত্র' ভাবনায়, চিন্তায় ও মনন ধর্মে অনাস্বাদিত নূতনত্বের সুর স্পন্দিত করিয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবুজ-পত্রের প্রেরণা-উৎস। প্রমথ চৌধুরীর প্রখর ব্যক্তিত্ব চিন্তা ও আদর্শবোধ সবুজ-পত্রের অভিনবত্বের অন্যতম কারণ। 'ভারতী' (১৩২২ বঙ্গাব্দ/- ১৯১৪-১৫) নামক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। 'সবুজ-পত্র' ও 'ভারতী' উভয় পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেকালের সাহিত্যে বিশেষভাবে কথা-সাহিত্যে নূতন চেতনা ও নবীন প্রবণতা সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 'ভারতী' 'সবুজ-পত্রের' মত স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী ছিল না তবে অনাগত বা প্রত্যাসন্ন নূতন যুগের প্রাণময়-চাঞ্চল্য অনুভূত হইয়াছিল 'ভারতী গোষ্ঠী' লেখকদের রচনায়। তবে সবুজ-পত্রের স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল, মনন, গতি ও ব্যক্তি--স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সত্যই বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 'ভারতী' ও 'সবুজ-পত্র' উভয় পত্রিকায় যে সব রচনা স্থান পাইল তাহা সংকীর্ণ নীতিবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া, সমাজ-নিষিদ্ধ বহু বিষয়ও চরিত্রকে কাহিনীর আবশ্যক উপকরণ করিয়া তুলিয়াছিল – কারণ সম্ভবত ব্যক্তির মহিমা স্বীকৃতি ও সমাজের গতিহীনতার ঊর্ধ্বে মননশীল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার তাগিদেই। ইহাই সে যুগের প্রবণতা ও লক্ষণ – বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই দুইটি প্রধান মানসিক ধারা বর্তমান ছিল। ইহা ছাড়াও সাহিত্যে 'যুরোপের অভিঘাত' ও প্রমথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত মৌখিক ভাষার' সাহিত্যিক পূর্ণ-মর্যাদা নূতন দিগন্তের সূচনা করিয়াছিল। এই সময়ের বিশ-তিরিশ দশকের সাহিত্য বুদ্ধি-প্রবৃত্ত চিন্তা-প্রবল হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বীরবলের শিষ্য। গুরুর মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁহার উপর ক্রিয়া শীল হইয়াছিল। আর এই সুবাদে 'সবুজ-পত্রের' মুখ্য-প্রেরণাকারী রবীন্দ্রনাথের 'নব যৌবনের' ও 'জীবনের গতি-শীলতার' পরোক্ষ প্রভাবিত ধূর্জটি প্রসাদের উপর কম নয়। ব্যক্তির যে 'সমাজ-বিযুক্ত' বিশেষ একটি 'সত্তা' (বা Existance) আছে সেখানে সব দেশের নারী-পুরুষ ব্যক্তিমাত্র|– এই ধ্যান-ধারণা ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যে স্থান পায় নাই – বঙ্কিমচন্দ্র ক্লাসিক মনোভঙ্গীর অনেকাংশে পরিচয় দিয়াছেন প্রথা-সিদ্ধ পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে কল্যাণমুখী আদর্শে উত্তীর্ণ করাইয়াছেন – তাঁহার ক্লাসিক মনোভঙ্গীর ফলে সমাজ ও জাতির কল্যাণাদর্শের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে । তাঁহার মৃত্যুর কয়েকটি বছর পরেই বিশ শতকে যাত্রা শুরু হয় । আর এই সময় হইতেই বাঙালীর সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে গতিময় প্রাণোচ্ছল তরঙ্গ-প্রবাহ আসিয়া পড়িল । "মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে (বিশ) এই শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের যুগ সূচিত হইয়াছে । উনিশ শতকের শেষে বঙ্কিম যুগের অবসান ও বিশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্র যুগের অভ্যুদয় ।"[২] রবীন্দ্রনাথের 'করুণা'[৩] (উপন্যাস) তরুণ বয়সে বিলেত যাইবার পূর্বে ও পরে ('করুণা' উপন্যাস) লিখিত হইয়াছিল বঙ্কিমীধারায় । তাঁহার 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (প্রথম-প্রকাশ ১৮৮৩ খ্রীঃ) ও রাজর্ষি (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭ খ্রীঃ) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ রীতি স্পষ্ট (আংশিক-অনুসরণ) । সমাজ-সত্তা ও ব্যক্তি-সত্তা উভয়ের মধ্যে ব্যক্তি-ই প্রধান (নর-নারী উভয়েই) এই ক্ষীণ দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব 'চোখের বালি' উপন্যাস (প্রথম প্রকাশ ১৯০৩) ও 'নষ্টনীড়' ১৩০৮ বঙ্গাব্দ গল্পে দেখা দিয়াছে । 'নূতন কালের কণ্ঠস্বর' আপন মহিমায় ধীরে ধীরে সাহিত্যের আসনে স্থান করিয়া লইল । প্রমথ চৌধুরীর মনন ও প্রখর ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় লালিত ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালির' বলিষ্ঠ প্রভাবে দ্বিধা-মুক্ত এবং য়ুরোপের সাহিত্যের অভিঘাতে তরুণ ধূর্জটি প্রসাদ (জন্ম ১৮৯৪ - মৃত্যু ১৯৬১) মুখোপাধ্যায় 'সবুজ পত্রের' অন্যতম লেখক হিসাবে বুদ্ধিজীবী মহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়া-ছিলেন । "ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় গল্প এবং উপন্যাসও লিখিয়াছেন । ইঁহার উপন্যাস প্রবন্ধোচিত মননশীলতার পরিচয় বেশি । প্রথম বই 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩ খ্রীঃ) গল্পের বই । পাঁচটি গল্প আছে । স্টাইলে প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট । ধূর্জটিবাবুর সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা হইল উপন্যাস-ত্রয়ী — 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭), 'মোহনা' (১৯৪৩)[৪] । পোলিটিক্যাল ও সামাজিক আবেষ্টনে দুই সমসাময়িক নর-নারীর আত্ম-জিজ্ঞাসার ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত । বাঙ্গালা উপন্যাসের টেকনিকে এ বস্তু আনকোরা না হইলেও অপরিচিত বটে ।"[৫] মনন-প্রধান লেখকের প্রবণতা হইতেছে ব্যঙ্গধর্মীতা অথবা বক্তব্য-ধর্মীতা । ধূর্জটি প্রসাদের 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩ খ্রীঃ) গল্পের গুচ্ছে পাঁচটি গল্প আছে । গল্পগুলিতে সহজ-জীবন প্রত্যয়ের বদলে ব্যঙ্গাত্মক উগ্র বুদ্ধি-বাদের ঝোঁক বর্তমান । প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পার্থক্য এই যে যেখানে 'বীরবল' জীবন-অভিজ্ঞতা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন সেখানে বুদ্ধির-প্রাবল্যে ভরপুর তরুণ ধূর্জটি প্রসাদ মানব জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি - পরিণাম । সম্যক ধারণা না থাকিবার ফলে ও জীবন-অভিজ্ঞতার অভাবজনিত - প্রত্যয়ের ফলে আলোচ্য

গল্পগুলি পীড়াদায়ক । মনে হয় বুদ্ধির 'মহ্ লো' করাই যেন গল্পগুলির উদ্দেশ্য । এই পর্বে রচনা সম্বন্ধে ধূর্জটি প্রসাদ স্বীকার করিয়াছেন — "সবচেয়ে বেশি ছিল জীবন থেকে, বিশেষত সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি । বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃন্ত চ্যুত হ'য়ে পড়ি ।"[৬] ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুঝিয়াছিলেন নিছক বুদ্ধি-চর্চা মানুষকে নেতিবাদী করিয়া তোলে । বুদ্ধি-তর্ক-বিচারে মানুষ একেবারেই শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে — জীবনের গভীরতর সত্য সহজ আনন্দ ও মুক্তি--পিপাসায় ব্যগ্র হইয়া উঠিবে । হৃদয়ধর্মেই সে তাহার জীবনের রূপ-রস-গন্ধ ও সহজ বিশ্বাসের মধ্যে বাঁচিবার অর্থ খুঁজিয়া পাইবে । জীবনের সব কিছুর চরিতার্থতাই সত্তাকারের জীবনবোধ — এই প্রত্যয়টি ধূর্জটি প্রসাদের হইয়াছিল । মনন-ধর্মী বুদ্ধিবাদী মানুষ জীবনের সমগ্র রূপের তাৎপর্য সন্ধানের ব্যগ্র হইয়া উঠিবে — ইহা একান্তই স্বাভাবিক । বিশ-তিরিশ দশকের আধুনিক মননধর্মী-বুদ্ধি-প্রবল মানুষের অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব-আত্মার হাহাকার ও যন্ত্রণা - সহজ-জীবন প্রত্যয়ের অনুসন্ধান ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিনখানি উপন্যাস স্পষ্ট হইয়াছে ।

অন্তঃশীলা (১৯৩৫) উপন্যাসটির অঙ্কুর ছিল 'এই জীবন'[৭] নামক গল্পে । এই গল্পটি 'যুধিষ্ঠির দাস' ছদ্মনামে 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৪০ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । ইহার লেখক স্বয়ং ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য বন্ধুদ্বয় লেখকে ঐ গল্পটির সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া উপন্যাস রচনার জন্য প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন — উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) লিখিত হয় । অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭), ও মোহনা (১৯৪৩) উপন্যাস ত্রয়ীতে অনুকরণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অনেকটা পাকা হাতের ও জীবন-অভিজ্ঞতায় পরিচয় দিয়াছেন ধূর্জটিবাবু — "উপন্যাস ত্রয়ীতে তীক্ষ্ণ মননশক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ ঘটিয়াছে ।"[৮] 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) উপন্যাসের সূক্ষ্ম আভাস যেন 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩) গল্পের মনোরমা ও ক-বাবুর ঘনিষ্ঠতার কাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান । মনোরমা হইতেছে ক-বাবুর বন্ধুর শ্যালিকা । ক-বাবু - বুদ্ধি-প্রধান মননধর্মী ব্যক্তিত্ব । মনোরমাও ক-বাবুর ঘনিষ্ঠতা ক-বাবুর যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্ত্রীর মনে ঈর্ষার বহ্নি জ্বালাইয়া দেয় — এই থীম্ লইয়া রিয়ালিস্ট' রচিত । ক-বাবু নামটি সচেতন ব্যঙ্গ প্রয়াসের উদাহরণ — এর কাহিনীর সর্বত্র হৃদয়ধর্মের স্বাভাবিকতার পরিবর্তে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যঙ্গধর্মীতার প্রাধান্য - ফলে কাহিনী প্রথম দিকে উপভোগ্য হইলেও শেষের দিক যুক্তিহীন

অথবা বাগাড়ম্বরের চাপে রসোত্তীর্ণতায় হানি ঘটাইয়াছে । 'অন্তঃশীলা'-র লেখক 'রিয়ালিস্ট'-র মত ততখানি বুদ্ধি সচেতন নন । জীবনের গভীরতর অর্থের সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া 'অন্তঃশীলা' ও অন্য উপন্যাসদ্বয় 'আবর্ত' ও 'মোহনা' রচনা করিয়াছেন । পরকীয় প্রেম ও ঈর্ষাকাতর স্ত্রীর অন্তর্বেদনার কাহিনী 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের প্রধান বিষয় নয় — 'অন্তঃশীলা'-র ভূমিকায় ধূর্জটি প্রসাদ উল্লেখ করিয়াছেন — 'একজন তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল । বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া । কিন্তু পলায়ন অসম্ভব । নিকট অতীতে খগেনবাবুর রমলার প্রতি আকর্ষণ হ'ল অন্তঃশীলার বিষয় । খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এখানেই শেষ হয়নি, 'আবর্ত' ও 'মোহনা'-য় সেই ধারা চলেছে ।'[১] তাহা হইলে ইহাই স্পষ্ট হইতেছে যে 'অন্তঃশীলা'-য় বুদ্ধিজীবির 'মানসিক-অভিব্যক্তি'-ই উপন্যাসের বিষয় — ইহা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নূতন । আর এই অন্তর্মুখীনতার দ্বারা বুদ্ধিজীবির জটিল মানসলোকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ - যাহা পূর্বে বাংলা উপন্যাসে ছিল না । কেবল রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে (১৯০৩ খ্রীঃ) যে অন্তর্মুখীনতা লক্ষ করা যায় তাহা বুদ্ধিজীবির নয় । সাধারণ বাঙালী ঘরের নারীর । তাঁহার ভাবনায় বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়-ধর্মেরই প্রকাশ বেশি । বুদ্ধিজীবিরা জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্য খুঁজিতে ও উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইবে — ইহাই স্বাভাবিক — খগেনবাবুর (অন্তঃশীলা) অন্তর্দাহ ও জীবনের গভীরতর তৃপ্তিদায়ক উপলব্ধির অন্তঃসারশূন্যতা ও ব্যর্থতা 'আবর্ত' ও 'মোহনা' উপন্যাসদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে । জীবনের অর্থ বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য — একমাত্র হৃদয়-ধর্মেই তাহার শেষ ও চরমতম উপলব্ধি আসিতে পারে — বুদ্ধিতে যাহার ব্যাখ্যায় হয় না । খগেনবাবু 'অন্তর্মুখী' বুদ্ধিজীবি মানুষ । বুদ্ধির আলোকে জীবনকে পরখ করিয়া গ্রহণ করিতে তৎপর । আধুনিক 'সমাজ-বিযুক্ত' মানুষের ইহাই হইতেছে চরম সমস্যা । এই সমস্যা নর-নারীর সম্পর্ককে অধিকতর জটিলতর রূপ দিয়াছে বর্তমান কালসীমায় । 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রী সৌখিন । সে বুদ্ধিবৃত্তির ধার ধারে না । সে সন্দেহপ্রবণ ও অভিমানী । তাহার জেদ দুর্বার । তাই খগেনবাবুর জীবনে রমলাকে কেন্দ্র করিয়া তীব্র জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে । — নারী সাধারণত হৃদয়বত্তায় পুরুষের চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে । তাহার সমস্ত কর্ম-ভাবনার নিগূঢ়-চেতনাটি ভালবাসা ও হৃদয়াবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । খগেনবাবুর পরকীয় প্রেমে (Extra marital love) ঈর্ষাকাতর, ঈর্ষাজ্বালায় জর্জরিত সাবিত্রী

আত্মহত্যা করিয়াছে । অপরন্তু খগেনবাবুর জীবনে যে তীব্র জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সাময়িক সমাপ্তি ঘটিল স্ত্রীর আত্মহত্যার পর ।

উপন্যাসের প্রকৃত যাত্রা এই প্রসঙ্গের পর হইতেই – খগেনবাবু জন্মান্তর ও বিবর্তন জটিল পথ - বাহিয়া মনোলোকের কোন দুরতিক্রম্য সুরঙ্গ পথে সাবিত্রীর বান্ধবী রমলার সঙ্গে প্রেমানুভূতির জোয়ার-ভাঁটায় গতিশীল বিচিত্র রহস্যময় চিত্র উপন্যাসের আসল বস্তু – ইহা খগেনবাবুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ । খগেনবাবুর মধ্যে আমরা **Intellectual brilliance** -এর আতিশয্য ও চমকপ্রদ স্ফুরণ লক্ষ্য করি । এই মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহার জীবনের সর্বকর্ম-ভাবনার নিয়ামক – **motif force** খগেনবাবু শুষ্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির তর্কবিতর্কে জীবন পর্যালোচনায় একান্তই ক্লান্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছেন এবং জীবনের প্রতি **'detached'** নিরাসক্ত মানসিকতায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন তখনই হৃদয়ে প্রেমের ফল্গু-ধারা সবকিছুকে অতিক্রম করিয়া স্ব-মহিমায় স্বাধিকার ঘোষণা করিল । যেন এই প্রেমের অস্ফুট স্ফুরণে তাঁহার চিন্তা-ক্লিষ্ট অবসন্ন-চিত্ত, তাহার সমগ্র সত্তা সুস্থির হইতে উন্মুখ । তবুও রমলার ভালবাসাকে অন্তরের সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করিয়া আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা গ্রস্ত - কারণ সম্ভবত খগেনবাবুর বুদ্ধিবৃত্তি । এই বুদ্ধিবৃত্তিই তাঁহার সমস্ত জীবন জিজ্ঞাসাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । তিনি আত্ম-বিশ্লেষণ ও স্থিরতা পাইবার জন্য কাশী চলিয়া যান । সেখানে আত্ম-সমীক্ষার দ্বারা কোনো শেষ সিদ্ধান্তে বা গভীরতর উপলব্ধিতে উপনীত হইতে পারেন কি না ? কাশীতে খগেনবাবুর অবস্থা কী রূপ হইয়াছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট হইবে – "কাশীর আকাশ-বাতাসে, ধর্মচর্চার কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রুদ্ধ বাসনার অঙ্কুরোদগমের যে অনিবার্য প্রেরণা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই খগেনবাবুর চিত্তে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল । এই প্রাণ-ধর্মের প্রবল ঝলকে জীবন-সম্মুখে নূতন সত্যের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে । আদর্শবাদের মানদণ্ডে জীবনকে মাপিবার প্রচেষ্টার সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়িয়াছে । জীবনে প্রেম যে সহজ ও সুন্দর সামঞ্জস্য আনিয়া দেয় .... এই সত্যের উপলব্ধি আসিয়াছে ।"[১০] কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হৃদয়াবেগকে সহজ সত্যরূপে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি রূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত । 'হ্যামলেট'-এর মত দ্বিধা **'to be or not be be'**- এই প্রশ্নই এই জিজ্ঞাসাই তাঁহাকে (খগেনবাবুকে) ক্লিষ্ট করিয়াছে । আধুনিককালে বুদ্ধিপুষ্ট মননধর্মী মানুষের এই সংকট যেন খগেনবাবুর

মধ্যে রূপ পাইয়াছে । একদিকে প্রেম-বুভুক্ষু তৃষিত হৃদয়-সত্তা অপরদিকে শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তি ও মননধর্ম । এই দুই বিপরীত আকর্ষণ খগেনবাবুর জীবন জিজ্ঞাসাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল — অদ্যতনিক কালের নর-নারীর চিত্ত-বিক্ষোভ-এর ধারা ও প্রকৃতি সম্ভবত এই রূপই । শেষ পর্যন্ত খগেনবাবু (অন্তঃশীলা) বুঝিতে পারেন যে — "সাধনা, আদর্শ, বুদ্ধির অত্যাচারে চিত্ত আমার জর্জরিত ।"[১২] শেষ পর্যন্ত খগেনবাবু কাশী পরিত্যাগ করিয়া সুদূরে অজ্ঞাতবাস ও পরিব্রাজকের জীবনযাত্রা অবলম্বুন করিয়াছেন । এই উপন্যাস-টিতে একটানা গল্পের Plot পাওয়া যায় না । চিন্তা-সমাবেশই এই উপন্যাসের প্রধান ও অমূল্য সম্পদ — এই চিন্তার ধারাবাহিকতা নাই — বিক্ষিপ্ত অবচ্ছিন্ন । মনে হয় ধূর্জটি প্রসাদ খগেনবাবুর বুদ্ধিদীপ্ত চেতন মনের বিকাশ ধারা ক্রমটি দেখাইবার জন্যও সেই আলোকে খগেনবাবুর তথা আধুনিক মানুষের মননবৃত্তের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । আধুনিক উপন্যাসে ঘটনা থাকে না - থাকে চিন্তা । চেতনার স্রোত (Stream of Consciousness) । এই চেতনার স্রোত নাটকীয় হয় না । জীবনে সব সময়ই নাটকীয় ঘটনা ঘটে না — যাহা ঘটে তাহা তুচ্ছ, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক কার্য-কারণ পরম্পরায় এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয় — কখনও দু'কূল ছাপাইয়া বান ডাকে আবার কখনও জোয়ার-ভাঁটায় গতিশীল । দুপ্টার দৃষ্টি যদি মর্মভেদী হয় তবে এই স্রোতে কত যে ঘূর্ণি, আবর্ত ও ঢেউ তাহার সমষ্টিই তো জীবন । এই জীবনের তাৎপর্য ও গভীরতা নির্ধারণ শিল্পীর কাজ । ধূর্জটি প্রসাদের দৃষ্টি মর্মভেদী তাই 'অন্তঃশীলা'-য় খগেনবাবুর বিবর্তনের ধারাটি প্লট বা ঘটনা পরম্পরার দ্বারা বিবৃত না করিয়া খগেনবাবুর মননবৃত্তে ও হৃদয়সত্তায় চেতন-অবচেতন মনের রহস্যনিচয় চিন্তাস্রোতের জোয়ার-ভাঁটায়' অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন । ধূর্জটি প্রসাদ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত । তাঁহার বৈদগ্ধ ও ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে 'অন্তঃশীলা'-র খগেনবাবুর ভাবনায় । আধুনিক মননধর্মী মানুষের মানসিক অভিব্যক্তি খগেনবাবুর মধ্যে আভাসিত হইয়াছে মনে হয় । 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) চরিত্র প্রধান উপন্যাস নয় । ঘটনার প্রাধান্যও অনুল্লেখযোগ্য । কেবল চেতনার অস্পষ্ট ধারার মধ্যে অবচেতন-চেতন লোকের অস্পষ্ট আলো-আঁধারে খগেনবাবু যেন ক্ষণিক বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত উদ্ভাসিত হইয়া পুনরায় অন্তরের মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীলতার চাপা গম্ভীর-বুদ্ধিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের পুঞ্জীভূত মেঘভারে ভারাক্রান্ত । চাপা বেদনার্ত

গর্জন তাঁহার হৃদয়-কন্দরে গুমরিয়া পুনরায় বুদ্ধির-দীপ্তিতে চেতনলোকে অবিরাম গতাগতি করিতেছে — তাঁহার চিন্তাস্রোতের গতিশীলতা কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপেরই আর একটি রূপ — এই রূপের মধ্যেই আধুনিক ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক জীবন-রস-সমৃদ্ধ সত্তাটির 'সংকটারূঢ়' পূর্ণাবয়ব চিত্র দুর্লভ নয়। 'সংকট' উদ্ভূত হইয়াছে মূলত 'বুদ্ধি' ও হৃদয়' উভয়ের বিবিধ ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ায়। 'সংকট' মোচন সম্ভাবিত হয় নাই — ইহাই বোধ করি আধুনিক 'চিন্তা-প্রবণ' বুদ্ধিবাদী মানুষের 'ট্র্যাজেডি'। এই পরিণতি দেখাইবার জন্য অন্নদাশংকর য়ুরোপের পটভূমি ও প্রতিবেশের সহিত ভারতীয় বা স্বদেশীয় সংস্কার ঐতিহ্যধারা ও জীবনবোধের গূঢ় সঞ্চারী সত্য-অন্বেষণকারী মুক্ত-দৃষ্টির আলোকে সবকিছুকে যাচাই করিয়া গ্রহণ-বর্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন — কিন্তু ধূর্জটি প্রসাদ আধুনিক 'চিন্তা-প্রবণ' মননধর্মী মানুষের (খগেনবাবু) মানসিক অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করিবার জন্য য়ুরোপের পটভূমি ও প্রতিবেশের অবতারণা করেন নাই — তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী মূলত এক না হইলেও সমধর্মী - উভয়েই 'সমাজবিযুক্ত' চিন্তাশীল আধুনিক মানুষের মানসিক অভিব্যক্তি 'চেতন - অবচেতন' লোকের বার্তাবাহী চরিত্র (নর-নারীর) উপন্যাসে সুনিপুণ মর্মভেদী সূক্ষ্মদর্শিতার সাহায্যে চিত্রিত করিয়াছেন। উভয়েই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। উভয়েই জীবনের গভীরতর অর্থের সন্ধানী। উভয়েই অন্তদর্শী দ্রষ্টার মন লইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন - প্রথম যুদ্ধোত্তর (ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) ও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর 'সংকটারূঢ় মানবাত্মার' জটিল-জীবন সমস্যা। যাহার সমাধান এখনও করায়ত্ত নয়। ভবিষ্যতে আধুনিক মননের আলোকে যদি কোনো জীবনের নূতন মূল্যবোধ গড়িয়া উঠে তবেই হয়ত যে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন সংকুলতা অন্নদাশংকর, দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহার পরিণাম ও সঙ্গতি অনায়াসলভ্য হইবে।

'অন্তঃশীলা'-য় 'স্রোতের' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 'চেতনা স্রোত' বা 'চেতনা-প্রবাহের' ইঙ্গিতবহ। এই চেতনা-স্রোত (Stream of Consciousness)-এর প্রয়োগ পাশ্চাত্য মুলুকের সাহিত্য সর্বপ্রথম সুরু হয়। যতদূর মনে হয় বিস্মৃত প্রায় লেখক Oliver Wendell Holmes (1809-1894) লিখিত 'The Professor at the Breakfast Table'(1859) গ্রন্থখানিতে 'চেতনা-প্রবাহ' শব্দটির

আভাস লক্ষ করা যায় — "The concept of stream of consciousness was taking shape even the early days of 1859 A.D. ...... An almost forgotten writer, Oliver Wendell Holmes (1809 - 1894) used stream of consciousness in 'The Professor at the Breakfast Table' (1859)"[১৩] 'Stream of Consciousness' ('চেতনা-স্রোত') শব্দটি - Psycho-Therapy বিদ্যার অন্তর্গত। ফ্রয়েড ও ইয়ুং ইহার প্রবক্তা। চরিত্র প্রধান ও ঘটনাবহুল উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের সাধারণ সর্বস্বীকৃত প্রণালীগুলি ব্যবহার করা হয়। মনের সচেতন লোকের বার্তাবাহী ও লীলা-বৈচিত্র্য মুখর সেইসব চরিত্র। একালের 'চেতনা-প্রবাহ' ধর্মী উপন্যাসে 'সচেতন-অবচেতন' লোকের সব আলো-আঁধারি স্তরগুলি ও তাহার অভিব্যক্তি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায় — অন্নদাশংকরের 'রত্ন ও শ্রীমতী' তিন খণ্ডেই রত্নর ভাবনায় ও শ্রীমতীর চিঠিতে 'চেতনা-প্রবাহ' পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগ দুর্লক্ষ্য নয়। আর বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ' (১৯৩৪), আয়নার মধ্যে একা (১৯৬৭-৬৮) ও নীলাঞ্জনের খাতা (?) গ্রন্থগুলিতে এই 'চেতনা-স্রোত' প্রয়োগ রীতি স্পষ্ট করিয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে চেতন-অবচেতন মনলোকের উভয় স্তর মিলিয়া ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপ — এই রূপের মধ্যেই আছে জীবনের গভীরতর অর্থ নিগূঢ়তম সত্য। ফলে উপন্যাসে অসংলগ্ন-চিন্তা বা চিন্তা স্রোতের মধ্যেই চাপা থাকে চরিত্রের নিগূঢ় স্বরূপটি। আধুনিক কালের বিশ-তিরিশ-এমনকি চল্লিশ ও চল্লিশোত্তর দশকের উপন্যাস রচনায় যেসব উল্লেখযোগ্য লেখক নূতনত্বের দাবী করিতে পারেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এই রীতির কমবেশী ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষিত মানুষের চিন্তা-প্রবল জটিল মন মননের ব্যাপারে 'বহতা' নদীর মত। নানা তরঙ্গ, ঘূর্ণি ও আবর্ত। নানা ঢেউ নানা কম্পন। আধুনিক মনের, আধুনিক চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইলে উপন্যাসের মধ্যে 'চেতনা-প্রবাহ' পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে হয় নতুবা আধুনিক মানুষের মনের নানা জটিলতার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ধূর্জটি প্রসাদ পাশ্চাত্য সাহিত্যে পারঙ্গম। সমাজবিদ্যায় পণ্ডিত। আধুনিক সমাজ ও মানুষের ভূমিকা সেখানে কতটুকু? বিভিন্ন 'ইজম' মনুষ্যজীবন ও অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থায় একান্তই অত্যাবশ্যক কি না? মানুষের জীবনে ও তাহার পারিপার্শ্বিকের উপর ইহার প্রভাব কতখানি। আধুনিক মানুষের মন ও চিন্তার উপর ইহার নিয়ন্ত্রী

ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে । ফলে আলোচ্য উপন্যাস 'অন্তঃশীলা'-য় নানাবিধ প্রশ্নসংকুলতা ও জীবনমুখী জিজ্ঞাসা আভাসিত হইয়াছে । মোট কথা উপন্যাসখানি অন্তর্মুখী হইয়াছে । চরিত্রের যে রূপটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা কালান্তরের বিপর্যস্ত মানসিকতার বার্তাবাহী । আর এই বার্তাবহণকারী উপন্যাস রচনা করিয়াছেন ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ গার্ট্রুড স্টীন প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ । ইঁহাদের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিজীবী লেখক কুলকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছিল । আধুনিক কালের উপন্যাসে এই রীতির প্রয়োগ-ব্যাকুলতা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দেয় । 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের নায়ক বুদ্ধি-নির্ভর-কখনো কখনো হৃদয়ধর্মের তাড়নার হুল অনুভব করে তবে তাহা ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমকের মত । পরক্ষণেই তাহা মননের আধিপত্যে ক্ষীণ-প্রাণ শক্তিহীন হইয়া পড়ে । ইহাই কি তবে আধুনিক মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত হৃদয়-ধর্মের চিরন্তন বিরোধ ?

চেতনা-প্রবাহের একটি দৃষ্টান্ত 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে । গঙ্গায় স্ত্রী সাবিত্রীর মৃতদেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে । খগেনবাবু সেই বাস্তব দৃশ্যের দিকে অপলক নয়নে চাহিয়া আছেন । – "কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতিশীঘ্র দাউ দাউ করে । মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ, যেন উনুনে ভাত পড়েছে । সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে । তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল । তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন- যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না । সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয় – এখান থেকে চলে যাও । চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে । ...... প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে ; পুট্‌, পুট্‌ করে শব্দ হতে লাগল । পা ফেটে জল বেরুচ্ছে ।"[১৪] এই দৃশ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তব হইতে অতীত-স্মৃতি (সাবিত্রী ও খগেনবাবুর), স্ত্রীর জীবদ্দশার তুচ্ছ ঘটনা (ভাতের হাঁড়ি উনুনে ফাঁসিয়ে ফেলা – পোড়া মাড়ের গন্ধ) - তৎসঙ্গে চিন্তা-অনুষঙ্গ দগ্ধ শবের দুর্গন্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া চেতনা-প্রবাহের অসংলগ্ন ধারাটি অস্পষ্ট চেতন-অবচেতন লোকে গতায়াত করিতেছে । সমস্ত ঘটনা যেন খগেনবাবুর মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে ।

উপন্যাস ত্রয়ী — 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনায়' নায়ক খগেনবাবুর মানস-অভিব্যক্তি দেখান হইয়াছে — ইহা অনেকাংশেই চেতন-অবচেতনের বার্তাবহী । ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে আত্ম-বিশ্লেষণ ও উহা হইতে নিষ্কাশিত নানা আত্ম-জিজ্ঞাসা । নায়ক আক্ষরিক অর্থে বুদ্ধি-জীবী ও আত্মানুসন্ধানী । জীবনের গভীরতার তাৎপর্য সন্ধানে বুদ্ধিকেই প্রয়োগ করিয়াছেন । যাহা তাঁহার জীবনে অন্তঃশীল ছিল, যে অভিজ্ঞতা সচেতন লোকে প্রকাশ-কুণ্ঠ তাহাই যেন অবচেতনার মধ্যে নিমজ্জিত । 'মোহনা' নামক উপন্যাসে খগেনবাবু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি স্তর অতিক্রম করিয়া প্রাণ-উদ্বেল বিপুল জীবন সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছেন — বুদ্ধি-বাদের উপর হৃদয়-ধর্ম জয়ী হইয়াছে — এই জীবনে বিপুল শান্তি ও বিপুল বিরতি । স্থির প্রত্যয়-সিদ্ধ জীবনবোধে খগেনবাবুর 'মোহনা'-য় উত্তরণ । এই ত্রয়ী উপন্যাস ঘটনা-নির্ভর নয় । চিন্তা-স্রোত ও চেতনার প্রবাহ ইহার মুখ্য অবলম্বন । উদ্দেশ্য বুদ্ধিজীবীর 'মানস-কূট' চিত্রণ । 'আবর্ত' উপন্যাসে খগেনবাবু প্রথমাংশে অনুপস্থিত - স্থান জুড়িয়া আছে সুজন-রমলার কাহিনী । তাই 'আবর্ত' উপন্যাস মননধর্ম অপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে । রমলা উজ্জয়িনীর ('সত্যাসত্য' - অন্নদাশঙ্কর রায়) মত পুরুষান্তরকে কেন্দ্র করিয়া প্রেম-বুভুক্ষু হৃদয়ে শান্তি-বারি সিঞ্চন করিয়াছে । তাই রমলার প্রত্যাখ্যাত প্রেম (খগেনবাবুর প্রতি নিবেদিত) সুজনকে আশ্রয় করিয়াছে যেমন বাদলকে না পাইয়া উজ্জয়িনী যাহা করিয়াছিল কৃষ্ণ-প্রেমে পরপুরুষে প্রেম নিবেদন । যদিও অন্নদাশঙ্কর উজ্জয়িনীর এই ভাবান্তরের কার্য-কারণ ব্যঙ্গাত্মক সূক্ষ্মদর্শিতায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । রমলা ও উজ্জয়িনী উভয়েই নারী — 'Eternal Feminine' — তাহার সমগ্র কর্ম-প্রেরণার মূলে রহিয়াছে প্রেম — 'Her whole existance' - এই জীবন সত্য খগেনবাবু ও বাদল বুদ্ধির-প্রাধান্যে বুঝিতে পারে নাই । নারীকে উভয়েই (খগেনবাবু ও বাদল) সম্যক দৃষ্টিতে বুঝিতে, তাহার অন্তর-সত্তার পরিচয় পাইতে সচেষ্ট হয় নাই- বুদ্ধিজীবী মানুষের ইহাই সবচেয়ে বড় বিপত্তি । এই বিপত্তির পথ বাহিয়া আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনের সব জটিলতার উদ্ভব । ইহা হইতে পরিত্রাণ কোথায় ? 'মোহনা' উপন্যাসে জীবনের কল্যাণাদর্শের দিকটি পরিস্ফুট হইয়াছে । মানুষের সেবা ও কল্যাণ-কার্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা - এই উপলব্ধিও দার্শনিক প্রত্যয় খগেনবাবুর হইয়াছে । খগেনবাবুর এই অভিজ্ঞতাও উপলব্ধি ঘটাইতে নানা রকমের ঘটনার- বাহুল্য ও তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হইয়াছে যাহা হয়ত উপন্যাসের আভ্যন্তরীন ঐক্য-বিধায়ক নহে-

অনাবশ্যক । 'আবর্ত' উপন্যাসে সুজন-রমলার হয়ত প্রয়োজন ছিল — রমলার প্রেম-বুভুক্ষু নারী হৃদয়ের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য । কিন্তু খগেনবাবুর পরিবর্তনের স্তর পরম্পরায় দেখাইবার জন্য অনাবশ্যক ঘটনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়াছে । চিন্তা স্রোত চেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম - ধারা ও গতি উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ অনাবশ্যক ঘটনা শ্রমিক আন্দোলন, সমাজ-তন্ত্রবাদ, সফিক - বিজনের ভূমিকা অনাবশ্যক ও দীর্ঘ বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক । আমার মনে হয় এইসব মতবাদ ও বিশ্বাস বা আন্দোলন নায়ক খগেনবাবুর জীবনে ব্যাপক জনজীবনের ও বৃহৎ কর্মপ্রবাহের মানুষের কল্যাণাদর্শে উন্মুখ করিয়া বৃহত্তর গভীর জীবনবোধের স্বাদ দিয়াছে । এই সব ঘটনা ও তর্ক-বিতর্কের সার্থকতা এই খানেই । খগেনবাবুর মত একজন 'ইন্টেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই' ধূর্জটি প্রসাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ।

ধূর্জটি প্রসাদ ও অন্নদাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় মূলত সমধর্মী । বাদল চরিত্র চিত্রণে - বুদ্ধিবৃত্তি যে শেষ পর্যন্ত নেতিবাদে পরিণত হয় এই সত্যই যেন বাদল চরিত্রের মূল সুর । বাদল জগত ও জীবনের গভীর অর্থ বুদ্ধি ও ইজমের অত্যাচারে খুঁজিয়া পায় নাই তাহার শেষ আশ্রয় মৃত্যু — জগত ও জীবন হইতে 'অপসরণ' । তাই বলিতে হয় অন্নদাশঙ্করের গভীর জীবন-প্রত্যয় 'বুদ্ধির-ধনি' বাদল- চরিত্রে পরিস্ফুট হয় নাই, হইয়াছে সুধীর চরিত্রে সুধী-বাদল চরিত্র দুইটি যেন দুইটি বিরোধী জীবন-চেতনায়, দুইটি বিপরীত ভাবধারায়, বিপত্তকীয়া মনের সহিত বুদ্ধি ও মননের সংমিশ্রণে নানা 'ইজম্' ও বিশ্বাসের উপাদানে পুষ্ট আর একটি যেন 'হৃদয়-নির্ভর' ঐতিহ্যবাহী জীবন দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্ট । জীবনের গভীরতর অর্থের সন্ধানী অন্নদাশঙ্কর সুধীর স্রষ্টা । যদিও খগেনবাবু (অন্তঃশীলা) বুদ্ধি-মার্গে বিচরণ করেন তথাপি বাদলের পথ গ্রহণ করেন নাই । ইহার কারণ সম্ভবত খগেনবাবুর জীবনে স্ত্রী সাবিত্রী ও স্ত্রীর বান্ধবী রমলার ভূমিকা । সুগন্ধী পুষ্প - যেমন গন্ধ বর্তমান থাকে তেমনি সাবিত্রীও রমলা দুই নারী তাহাদের প্রেম-সৌরভে খগেনবাবুর বুদ্ধি-দীপ্ত মননবৃত্তে প্রাণের চাঞ্চল্য-জীবনের প্রতি গভীর অনুরক্তি ও আসক্তি সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয় নাই । রক্তকরবী (১৯২৬) (রবীন্দ্রনাথ) নাটকে নারী-নন্দিনী । "সেই নারী শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগার ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করে দেখিল — সেই তত্ত্ব বর্তমান । নন্দিনীর ভালবাসায় — রঞ্জনের প্রতি তাহার অনুরাগের স্পর্শে - সবাই প্রাণের গতিতে

চঞ্চল। আর এই নারী-শক্তির আর এক রূপ দেখি খগেনবাবু ও রমলার আকর্ষণে। রমলা চিরন্তন নারী শক্তি - নন্দিনীর Spirit ও রমলা প্রায় একই। উভয়েই জীবনের পূর্ণতা প্রেমে খুঁজিয়াছে। খগেনবাবুর সহিত সাবিত্রীর দেহগত ও মনগত সামঞ্জস্য হয় নাই ইহা ধরিয়া লইলেও নারীর প্রেমের যথার্থ ভূমিকা তাঁহার জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল। সাবিত্রীর আত্মহত্যা অস্বাভাবিক। ইহাতে খগেনবাবু ও সাবিত্রীর উভয়েরই বন্ধন মুক্তি ঘটিয়াছে। যাহাকে তিনি ভালবাসিতে দ্বিধাগ্রস্ত তাহার সান্নিধ্য ও ভালবাসার বন্ধন হইতে মুক্তি আর সাবিত্রীর পক্ষে দুর্বহ ঈর্ষা এই অপ্রেমিক স্বামীর সহিত সমাজ-অনুমোদিত বন্ধন হইতে মুক্তি। আর একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে ধূর্জটি প্রসাদ খগেনবাবুর মধ্যে বাদল-মুখী বৈশিষ্ট্য ধর্মের সমন্বয় করিয়াছেন — বুদ্ধি বৃত্তির সহিত হৃদয়-ধর্মের 'হেড' ও 'হার্ট' -এর মিশ্রণ-জাত চরিত্র খগেনবাবু। আর রমলা-সাবিত্রী (অন্তঃশীলা) ও উজ্জয়িনী নিখাদ নারী-সুলভ ধাতুতে গঠিত। ইহাদের মধ্যে কিরণময়ীর (চরিত্রহীন) ঔদ্ধত্য নাই বিনোদিনীর (চোখের বালি) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই। ইহারা চিরন্তন নারী। ভালবাসার আদান প্রদানে জীবিত থাকে অন্যথা তাহাদের আত্মিক স্ফুরণ হয় না।

খগেনবাবুর শেষ পরিণতিতে দেখি তিনি বুদ্ধিবাদের সংশয় বিচার-প্রবণতার শী শূন্যতা আত্মার অন্তর্জ্বালা নানা পথ অতিক্রমণ করিয়া খুঁজিয়া পাইয়াছেন জীবনের অর্থ — মানুষের প্রতি ভালবাসা কল্যাণাদর্শে নিবেদিত কর্মযোগ - নিষ্কাম কর্মযোগ - ইহার মধ্যে যে মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা আর অনুরাগই প্রধান। মানুষের প্রতি ভালবাসার পথই তো জীবনের পথ — এই পথের 'মোহনায়' — 'শ্রমিক-ধর্মঘট', 'শ্রমিক আন্দোলন' সবই মূলে মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই তো এই সব মনুষ্যহিতকারী 'ইজম' ও আন্দোলন। একালের বুদ্ধিজীবী মানুষ নগরে বাস করে। নগরে নগরে কলকারখানা-শ্রমিক-মালিক-বিরোধ ও আন্দোলন নানাবিধ 'ইজম'-এর আদর্শ। তাই একালের মননধর্মী মানুষ অন্তরে সংশয়াচ্ছন্ন ও 'সংকটাতুর'। তাহার আত্মার 'Crisis' উদ্ঘাটন করাই এই উপন্যাস ত্রয়ীর ('অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা') উদ্দেশ্য। আত্মার স্বরূপ ও গভীরতর রহস্য উদ্ঘাটনে ধূর্জটি প্রসাদ Spiritual দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ মানুষের (নরনারীর) বিশেষ শাশ্বত অন্তর্মুখী ধর্ম থাকে — সেই শাশ্বত অন্তরমুখী ধর্মবোধের (শুভাশুভ ও কল্যাণবোধ) দ্বারাই মানুষ নিজেকে ও সমাজকে রক্ষা করিয়া চলে। সাহিত্যে এই

অন্তর্মুখী ধর্মবোধের স্বাতন্ত্র্য ঘটিলে উহা জীবন হইতে অনেক দূরে অবাস্তব কল্পলোকের অনাবশ্যক সামগ্রী হইয়া উঠে । "সমাজ জীবনের বহির্মুখী কোন নৈতিক সমস্যা, তাহার উত্থান-পতন, তাহাদের সম্পর্কে কোন বাদানুবাদ কিংবা তর্ক-বিতর্ক জীবনের গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ উপন্যাস যদি সেখানে আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাহার কোন মূল্যই নাই ।"[১৫] আমার বিশ্বাস উপন্যাস ত্রয়ীতে (অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহনা) জীবনের সত্য নানা দুর্ভেদ্য তর্ক-বিতর্ক, ইজম, মননবৃত্ত ও বুদ্ধির দুর্মোচ্য জাল দীর্ণ করিয়া অধিকতর শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই খানেই ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শক্তিমত্তার ও মর্মভেদী অন্তর দৃষ্টি পরিচয় দুর্লভ নয় ।

দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭– ১৯৮০)

বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তবনিষ্ঠ জীবন সমস্যার প্রাধান্য
দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)

"আমার লিখিত 'দিলীপ কুমার রায়' শীর্ষক নিবন্ধটিতে দিলীপ কুমারের রচিত উপন্যাসগুলির নায়ক-নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র (মনের পরশ উপন্যাস ব্যতীত) -গুলির 'ছন্দ-দেহ' হইতেছে 'Super Intellect ' ও 'Supra Emotion' -এর harmonious Combination দিলীপ কুমার রায় সম্ভবত এই ধ্যান-দৃষ্টি তাঁহার গুরু শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইবার কিছু সময় পূর্ব হইতেই দিলীপ কুমার রায় পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ 'Life Divine [১৬] ও ' Sabitri [১৭] মহাকাব্যখানি রচনা করিতেছিলেন। দিলীপ কুমার রায়ের [১৮] কয়েকটি উপন্যাসের প্লট ও চরিত্র সৃষ্টির মূল-প্রেরণা ও 'ছন্দ-দেহ' শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরীতেই পরিকল্পিত ও রচিত হইয়াছে। এই উপন্যাস রচনার সৃজনী-প্রেরণা ও শক্তি-লাভের জন্য গুরু শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের 'মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন'[১৯] — এই ঋষি ধারণাটির তত্ত্বগত দিকটির সূক্ষ্ম 'ছন্দ-দেহ' দিবার চেষ্টা করিয়াছেন দিলীপকুমার, সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে 'Super Intellect' ও 'Supra Emotion' -এর উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে অতিমানস (Supramental Consciousness) অবতরণ করিবার পর ভবিষ্যতের মানুষ আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া যাইবে — বুদ্ধি-বৃত্তি ও হৃদয় ধর্মের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিক দিয়া। মনে হয় এই কথাটিই দিলীপকুমার রায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত গোপন রহস্য-ভাবী-কালের নর-নারীর বার্তাবাহী। আর এই অর্থেই চরিত্রগুলির মনন ও হৃদয়-ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধায়ক ধারাটি অতি-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতবহ। অদ্যতনিক মানুষ নানা ধ্যান-ধারণার, পথ ও 'ইজম'-এর অভিঘাতে 'চিন্তা-প্রবল' মনন-ধর্মী হইয়া পড়িতেছে - হৃদয়াবেগও মননের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত — বহু ক্ষেত্রে অবদমিত। দিলীপ কুমার রায়ের উপন্যাসে (মনের পরশ বাদে) 'মনন-বৃত্ত' ও 'হৃদয় ধর্ম' যেন গাণিতিক যুক্তি পরম্পরা স্বীকার করিয়া প্রেমের লীলায় আগন্তুক অতিথি আর নয় ইহা যেন আধুনিক নর-নারীর আর এক অভিব্যক্তি — অহার ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন — ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা।"

দিলীপ কুমার রায় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের একমাত্র পুত্র। অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের প্রমুখ সাহিত্য গুরুর প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন মনস্বী সেখানে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে যাঁহারা পন্ডিচেরীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় অন্যতম পরে অবশ্য তাঁহার শ্রীমায়ের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় পুণায় চলিয়া যান ও সেখানে হরিকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই তাঁহার সাম্প্রতিক তিরোধান হয়। দ্বিজেন্দ্র লালের আরব্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় দিলীপ কুমারের লেখকরূপে আবির্ভাব। ইনি কবিতা, গান গল্প নাটক প্রবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি লিখিয়াছেন। দিলীপকুমার (মন্টু) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুকণ্ঠ ও সাহিত্য সঙ্গীত প্রীতির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সাহিত্যের দিকে তাঁহার সহজাত প্রবণতা ছিল।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর য়ুরোপের জীবন-পটের সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শের, চিন্তা-ভাবনার সমন্বয় নয় যুক্ত করিয়া প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার ব্যাপক ও জটিল জীবন চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, ফলে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছে আর কয়েকটি আধুনিক লক্ষণও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কেবল অন্নদাশঙ্কর রায় এ পথের একক পথিক নহেন। উপন্যাসের পরিবেশ পটভূমির নানা বৈচিত্র্য উপস্থাপনে য়ুরোপের জীবন-পরিবেশের প্রয়োগ-চিন্তা-ভাবনা, তর্ক-বিতর্ক বিচিত্র মতবাদ সমন্বিত জীবনের কাহিনীর উপন্যাসে রূপ-রচনায় কয়েকজন অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দিলীপ কুমার রায় অন্যতম। তবে য়ুরোপে বসবাস করিবার ফলে অতি-নিকট হইতে দেখিবার বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐ জাতীয় উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল।

দিলীপ কুমার রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁহাদের রচিত উপন্যাসে য়ুরোপের স্থানগত, কালগত পরিবেশ, য়ুরোপের নরনারী এবং য়ুরোপের আবহাওয়ায় (সামাজিক-রাজনৈতিক) পুষ্ট বাঙালী নরনারী — নানা তাত্ত্বিক চিন্তন ও মতামত দ্বারা প্রভাবিত মননবৃত্তের মুহু পরিবর্তনশীল মানবিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

দিলীপ কুমার য়ুরোপকে শুধু চিন্তার আলোকে দেখেন নাই, য়ুরোপের অন্তর্লোকে যেখানে পৃথিবীর সব নর-নারীই একই হৃদয়বত্তার পরিচয় বহন করে — মানুষের শাশ্বতবৃত্তির প্রকাশে প্রেম-প্রীতির দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে দেখিয়াছেন । এখানেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতা বা উদারতা ও অভিনবত্ব । "য়ুরোপের সঙ্গে দিলীপকুমারের বাঙালী নায়ক-নায়িকাদের পরিচয় প্রেমের রহস্য গভীর আলোয় ।"[১০] তিনি (দিলীপ কুমার রায়) উপন্যাসের যে পরিবেশ রচনা করিয়াছে তাহাতে প্রেমের পশ্চমার ও কাব্য-কলার আবহাওয়া এক অভিনব সূক্ষ্ম শিল্পী-প্রতিভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে ।

দিলীপ কুমার রায় দীর্ঘকাল য়ুরোপে বসবাস করিয়াছিলেন । সেখানকার সঙ্গীত, সাহিত্য, অন্যান্য শিল্পকলার সযত্ন অনুশীলন তাঁহার মনকে মার্জিত ও পরিশীলিত করিয়াছিল। তাঁহার রচিত উপন্যাস - মনের পরশ (১৯২৬ খ্রীঃ), রঙের পরশ (১৯৩৪), দোলা (১৯৩৩-৩৬), বহু বল্লভ (১৯৩৫) দু'ধারা (১৯৩৫), তরঙ্গ রোধিবে কে ? (১৯৩৮) প্রভৃতির পরিবেশও নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার প্রতিবেশ ও মানসিক প্রবণতা অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল । মনে হয় দিলীপ কুমারের সুমার্জিত মন ও সংযত চিত্ত বৃত্তি নায়ক-নায়িকার চরিত্র সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে — অনেকটা যেন লেখকের স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে চরিত্র সৃষ্টিতে । উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার প্রেম-বৈচিত্র্যের মধ্যেও সূক্ষ্ম শিল্পবোধও বর্তমান — ইহা লেখকের বিশেষ শিল্পী মানসের অভিব্যক্তি বলিয়া আমার বিশ্বাস । দিলীপ কুমার রায় সম্ভবত য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবেই অথবা দীর্ঘকাল য়ুরোপে বসবাস করিবার ফলে — সেখানকার জটিল জীবন-যাত্রা ও নানা মতবাদের চিন্তনের ফলে হয়ত সাহিত্যে রস-সর্বস্বতার (**art for art's sake**) বিরুদ্ধে মতবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক উপন্যাসে সমাজ-নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণমূলক অবান্তর প্রসঙ্গের অতি প্রাচুর্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন — তিনি উপন্যাসের রস-ভাণ্ডার নিছক বুদ্ধি-গত উপকরণ বাহুল্যে ভারাক্রান্ত করার প্রবণতাকে সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। "[১১]

দিলীপকুমার রায়ের পূর্বসূরীদের (বাংলা উপন্যাস- এর ক্ষেত্রে) ধারার অতিক্রম করিয়া তর্ক-বিতর্ক-বহুল মনন-চিন্তন-কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করাই তাঁহার অভীষ্ট ছিল। "দিলীপ কুমারের প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে, উপন্যাসের পরিধি ও প্রসার ক্রমবর্ধনশীল – ইহার মধ্যে মানব জীবনের সমস্ত প্রশ্নসংকুলতা, সমস্ত উত্তরহীন জিজ্ঞাসা, উহার সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা, আদর্শলোকের অভিমুখে অভিযান-প্রয়াস এক কথায় বর্তমান যুগে মানব চিত্তের সমস্ত আলোড়ন ও অনুপ্রেরণা আশ্রয় লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক।"[২২] আমার মনে হয় তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সমর্থনযোগ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু রসের- 'আর্টে'র দিক দিয়া জীবনের সবকিছুরই প্রয়োগ সমীচীন নয় – রবীন্দ্রনাথ এই অতি-আধুনিক ঝোঁক (tendency) পরিহার করিবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। দিলীপ কুমার রায়ের উপন্যাসগুলি বিষয়বস্তু প্রেম – প্রেমই। নর-নারীর প্রেমই ইহার অবলম্বন হইলেও নানা-মতবাদ-বিশ্বাস তর্কজালে প্রেম-বিবাহ-বন্ধুত্ব-সখ্য প্রভৃতি বৃত্তি ও মানসিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও মানব-জীবনে নর-নারীর শিক্ষিত রুচিশীল ও রুচিশীলা যুবক-যুবতীর মানস-পটে ইহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোন শাশ্বত মূল্য আছে কিনা? প্রেম দেহজ না মানসিক। প্রেমে নিষ্ঠা ও পবিত্রতার যৌক্তিকতা। একই সময়ে একই নারী দুই পুরুষকে ভালবাসিতে পারে কি না? এই শ্রেণীর নানা প্রশ্ন উপন্যাসগুলির নায়ক-নায়িকার মনে জাগিয়াছে – ইহাদের সম্ভাব্য সমাধান বা সদুত্তর দুর্লভ তো বটেই বরং বলা শ্রেয় এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কোনদিনই সম্ভব হইবে না কারণ মনুষ্য জীবন বাস্তবের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া থাকে। অতএব বাস্তবের প্রয়োজনেই নিষ্ঠার প্রয়োজন এক নারীতে বা এক পুরুষে ইহার অন্যথা হইলে - বিরোধ - অশান্তি। ইহাতে সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন নাই – বাস্তব ও সংসার জীবনের প্রয়োজনেই নর-নারীর প্রেম-ভালবাসাকে একমুখী হইতেই হয় - কারণ সংসার জীবনে অনেক-গুলি দাবীর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসাকে মানাইয়া চলিতে হয়। দিলীপ কুমার প্রশ্ন তুলিয়া সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই।

দিলীপকুমার রায় তাঁহার রচিত উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের গুরুত্ব হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন - মনে হয় যে পারিপার্শ্বিক ও দেশ-কাল হইতে তাঁহারা জীবন-রস আহরণ করিয়াছিলেন তাহার মূল স্বদেশের মাটিতেই প্রোথিত। এই কারণেই হয়ত তাঁহারা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়াছেন।

দিলীপ কুমারের উপন্যাসের[১৩] পটভূমি য়ুরোপ। য়ুরোপ পটভূমি এবং পাত্র-পাত্রী বিদগ্ধ-চিত্তের অধিকারী। যুক্তি-বিচারণার মাধ্যমে হৃদয়াবেগ বা প্রেম-ভালবাসার মত মানুষের সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলির স্ফুরণ ও ইহার পরিণতি সম্বন্ধে যাচাই করিয়া বুদ্ধির আলোকে গ্রহণ-বর্জন করিতে উন্মুখ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে দিলীপ কুমারের উপন্যাসে যেখানে প্রেমই আলম্বন সেখানে লেখক স্বকীয় মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। এই স্বকীয় মনোভঙ্গী ও প্রেম-ভালবাসা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধি সচেতন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা দীপ্ত। শরৎচন্দ্র প্রেমকে হৃদয়াবেগের কোমল সুন্দর পবিত্র অশ্রুধারা সিক্ত রসমাধুর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন - অর্থাৎ প্রেমকে সামগ্রিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন সেখানে অবশ্য হৃদয়াবেগের ভাবালুতার আতিশয্য থাকিতে পারে কিন্তু প্রেমকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিবার কোনো সযত্ন প্রয়াস দুর্লক্ষ্য সেখানে। ইহার কারণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা ও নায়ক স্বশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের-মধ্যবিত্তের মানসিকতা তাহাদের হৃদয়াবেগের নিয়ন্ত্রী। শরৎচন্দ্রের-দৃষ্টিভঙ্গী হৃদয়াবেগজাত। আর দিলীপ কুমারের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে মনন কেন্দ্রিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা গড়পরতা মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসিকতার প্রতীক আর দিলীপ রায়ের নায়ক- নায়িকা (য়ুরোপীয় ও স্বদেশীয়) যেমন 'মনের পরশ' (১৯২৬ খ্রীঃ), 'বহুবল্লভ', 'দু'ধারা' (১৯২৭ খ্রীঃ), 'রঙের পরশ' (১৯৩৪ খ্রীঃ), 'দোলা' দুই খণ্ড (১৯৩৫-৩৬) 'তরঙ্গ রোধিবে কে' - দুই খণ্ড (১৯৩৮ খ্রীঃ) গড়পরতা মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঊর্ধ্বে বিশেষ এক ' Free World' -এর সমর্থন প্রয়াসী - যেখানে সামাজিক-নৈতিক, মানসিক সঙ্কোচ-দ্বিধা ও বন্ধন বুদ্ধির বিচারণায় শিথিল হইয়া পড়িবে ও নর-নারীকে প্রেম-বিবাহ-প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হইবে — প্রকারান্তরে দিলীপ কুমারের উপন্যাসে এই বন্ধন-মুক্তিরই আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলির ক্রমবর্ধমান শিথিলতা তিরিশ ও চল্লিশ দশকের উপন্যাসে দেখা দিয়াছে। দিলীপ কুমার রায়ের উপন্যাস বিদগ্ধ মননশীল মানুষের জীবনকথা যে জীবনকে লেখক মননশীল মানুষের মন ও চোখ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন ও দেখিয়াছেন। প্রেম হৃদয়ের এক বৃত্তি। ইহার উৎস হৃদয়ের গভীরে। দিলীপ কুমার সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী। তিনি বুদ্ধির আলোকে হৃদয়ের এই বৃত্তিকে নানা বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া বুঝিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দিলীপ কুমারের উপন্যাসের নায়ক- নায়িকা বিদগ্ধতার পরিচয় দেয় প্রেম-বিষয়ক জটিল তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে। নর-নারীর প্রেম-কেন্দ্রিক যে বিভিন্ন সমস্যা ও নানা প্রশ্নসংকুলতা আধুনিক শিক্ষিত

মানুষের মনে প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে দেখা দিয়াছে তাহারই সূচনা অথবা পূর্বাভাস যেন উপন্যাস-আশ্রিত নায়ক- নায়িকার তর্ক-বিতর্কে ছায়াপাত করিয়াছে - আলোচিত ও বিশ্লেষিত ও হইয়াছে । দিলীপকুমারের উপন্যাসের (আলোচ্য পর্বের) Theme হইতেছে নর-নারীর "প্রেমের সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা বিবাহের সম্পর্ক, প্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ, প্রেমের সঙ্গে দেহকামনার প্রভেদ কোথায় ও কতখানি, প্রেম ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, প্রেমের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা অবশ্য প্রয়োজনীয় কি না ; এবং একই সময়ে একাধিক নারী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সম্ভব ও সঙ্গত কি না — এই সব প্রশ্নের সূক্ষ্ম তর্ক - বিতর্কে দিলীপ কুমারের উপন্যাসগুলি মুখর ।"[১৪] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্নদাশঙ্কর রায় এই সব জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নসংকুলতা তাঁহার উপন্যাস 'সত্যাসত্য' ছয় খণ্ড (১৯৩২-৪২), 'অসমাপিকা' (১৯৩৭ খ্রীঃ), 'না' (১৯৫১), 'কন্যা' (১৯৫৩), 'বিশল্যকরণী' (১৯৩৭ খ্রীঃ) 'তৃষ্ণার জল' (১৯৬৮ খ্রীঃ), 'রত্ন ও শ্রীমতী' ১ম খণ্ড (১৯৫৬ খ্রীঃ) 'রত্ন ও শ্রীমতী' দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৭ খ্রীঃ) 'রত্ন ও শ্রীমতী' তৃতীয় খণ্ড (১৯৭১ খ্রীঃ) উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহা হইতেছে ভারতীয় তথা গান্ধীবাদের ঐতিহ্য ধারার সহিত modernisation বা আধুনিকতার সুষ্ঠু সমন্বয় অভাবজনিত দ্বিধা । চরিত্র ও বক্তব্য বিষয়েও এই দ্বিধা বা দোটানার লক্ষণ পরিস্ফুট- এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসে শুধু প্রেম নয় মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের নানাবিধ রসের ও বৃত্তির অবতারণার পক্ষপাতী — তবে তাহা 'Delightful principle' - -এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই । দিলীপ কুমার রায়ের সহিত অন্নদাশঙ্করের মিল এইখানেই যে উপন্যাসের মধ্যে মানব জীবনের সমস্ত প্রশ্নসংকুলতা, সমস্ত উত্তরহীন জিজ্ঞাসা, উহার সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা, আদর্শলোকের অভিমুখে অভিযান-প্রয়াস, এক কথায় বর্তমান যুগে মানবচিত্তের সমস্ত আলোড়ন ও অনুপ্রেরণা আশ্রয় লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক ।' রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের সাহিত্য-এর প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন — "বর্তমান যুগে পূর্বযুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না । এখনকার মানুষ জীবনের যে সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তা প্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এই জন্যে তার মনন বস্তু জমে উঠেছে বিচিত্ররূপে । এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে ... । তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলছে । ..... অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা দেয়,

তখন তাকে বলায় চলায় সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্গত হয়ে উঠবেই। অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই।"[২৫] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আলোকে অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত পূর্ব-উল্লিখিত উপন্যাস ও দিলীপ কুমার রায়ের আলোচ্য পর্বের উপন্যাস বিচার করিলে বর্তমান যুগের সমস্যা-জটিল বুদ্ধের এক প্রাণ-চঞ্চল আলেখ্য পাওয়া যাইবে। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যাপকতা ও বিচিত্র গূঢ় সঞ্চারী বুদ্ধের পরিচয় আছে, দিলীপ কুমারের উপন্যাসের বিষয় ও উদ্দেশ্য অনেকাংশে সীমিত। তবে উভয়েই মনন-প্রধান লেখক যাঁহাদের জীবন সম্মুখে বোধটি নানা জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নসংকুলতায় সমাচ্ছন্ন। আধুনিককাল বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন-কোনোটিরই সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নয়। " আধুনিক মানুষ আর গৃহী নহে, পথিক, সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী নহে, রিক্ত, সর্বস্বীকৃত আদর্শবাদের দ্বারা সুরক্ষিত নহে, নূতন অবলম্বনের অন্বেষণে উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত; প্রেমিক নহে, রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রেমের বিশুদ্ধীকরণে ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিব্রত।"[২৬] দিলীপ কুমারের উপন্যাসে 'বাস্তবতা' বোধের আপেক্ষিক অভাবজনিত ত্রুটি নানাভাবে বর্তমান মনে হয় - কারণ বাঙ্গালী ছেলের প্রেমে ব্যাকুল য়ুরোপীয় ললনার ভাবাতিশয্য অনেকাংশে হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য উপন্যাসের কাহিনীগত দিক বৈচিত্র্যহীন – বাঙ্গালী তরুণের সঙ্গে য়ুরোপীয় তরুণীর বা বাঙ্গালী তরুণীর প্রেম। দিলীপ কুমারের দৃষ্টির ব্যাপকতার অভাব ছিল মনে হয়। বুদ্ধি প্রধান লেখকদের উপন্যাস তত্ত্বধর্মী হইবে অথবা বক্তব্য-প্রধান হইবে। বুদ্ধির প্রাধান্য অনেক সময় জগৎ ও জীবন সম্মুখে হৃদয়াবেগে রঞ্জিত সঠিক মূল্যায়ণ করিতে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে তাই বুদ্ধিপ্রসূত তত্ত্ব (Theory)-তে যাহা ঠিক বলিয়া প্রতীতি হয় বাস্তবজীবনেই তাহার প্রয়োগ অসম্ভাবিত হইয়া উঠে। ইহাই নেতি-ধর্মী বুদ্ধিবাদ। দিলীপ কুমারের উপন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে, বিচিত্র ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থাপন করিয়াছেন – উদ্দেশ্য প্রেমের অতলস্পর্শ রহস্য ও দুর্মোচ্য জটিলতার স্বরূপ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করিয়া তোলা। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মননধর্মী বিতর্ক আলোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটিলেও এই আলোচনা উপন্যাসের রসবস্তুর সংযোগ গভীর ও অন্তরঙ্গ হয় নাই – আমার মনে হয় দিলীপ কুমারের প্রথম উপন্যাসের (মনের-পরশ ১৯২৬) আপেক্ষিক দুর্বলতা এইখানে। দিলীপ কুমার সাহিত্যে রস-তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন – তিনি মানব জীবনের সকল প্রকার সমস্যা চিন্তা, ভাবনা ও মতবাদকে কথা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু

করিবার পক্ষপাতী ছিলেন — রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার মতান্তর হইয়াছিল । দিলীপকুমারের অন্যান্য উপন্যাস (মনের পরশ ১৯২৬ ব্যতীত) সম্বন্ধে বলা হয়ত সঙ্গত হইবে যে মানব জীবনের সকল-প্রকার সমস্যা ও জটিলতা - নানা প্রশ্ন ও তর্ক বিতর্ক আধুনিক মানব-সমাজের জটিল সমস্যা সংকুল জীবন-আবর্ত হইতেই জাত — সুতরাং এই সব উপাদান -গুলি জীবন হইতেই উদ্ভূত, তাই শেষ পর্যন্ত এইসব যুক্তি-তর্ক, মত ও বিশ্বাস উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর (রঙের পরশ, দোলা, 'বহুবল্লভ' ও দুধারা) চরিত্র, জীবন ও জীবনবোধের সঙ্গে অনেকাংশে যুক্ত হইয়া অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় । তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র অতনু, রুজা, নন্দা, প্রদীপ, ডায়না, দ্রাশ্মিস, অথবা নিলয়, পিয়ের, রেনে, মীনা কেউই বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রাণহীন নয় - বরং স্বীয় হৃদয়াবেগ ও প্রাণ-ধর্মের জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উপকরণ যাহা 'রস-বস্তু' নয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহা স্থান জুড়িয়া উপন্যাসের রসোত্তীর্ণতায় বাধা-স্বরূপ হয় নাই । ইহা যেন বাঙ্গালা উপন্যাসের আঙ্গিক ও প্রযুক্তির দিক দিয়া নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে ।

দিলীপ কুমার মূলত মনন-ধর্মী ও বুদ্ধি-প্রধান লেখক হইলেও আধুনিক জীবনের জটিলতার রসোত্তীর্ণ (?) এক আলেখ্য উপস্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন । এই দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার সহিত অন্নদাশঙ্কর রায় ও ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অনেকাংশে সমধর্মী বলা অযৌক্তিক হইবে না । কারণ তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা বিচার ও তর্ক করিয়াছে ইহা যেমন সত্য তেমনি তাহাদের ভাবনা-চিন্তার দ্বারা জীবন ও প্রেমের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য ব্যাগ্র হইয়াছে — ইহাই আধুনিক মনন-প্রধান মানুষের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । মোট কথা দিলীপকুমার বুদ্ধি-ধর্মী তত্ত্ব-প্রধান চরিত্র সৃষ্টি বা উপন্যাস রচনা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, আবার হৃদয়াবেগ প্রধান প্রাণ-ধর্মী চরিত্র সৃষ্টি বা উপন্যাস রচনা তাঁহার একান্ত কাম্যও নয় — এই দুয়ের সমন্বয়ে জীবনের গভীরতর আধ্যাত্মিক স্বরূপ সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া কথা-সাহিত্য রচনায় তিনি বোধ করি আলোচ্য পর্বে ব্রতী হইয়াছিলেন । তাঁহার সমকালীন অধিকাংশ য়ুরোপীয় লেখকের মত তিনিও জীবনের "অন্তর্মুখী" নিগূঢ় তাৎপর্য সন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিলেন - যাহাতে আমরা জীবনের গভীরতর চেতনার গভীরতম সত্য অন্বেষণ করিতে সক্ষম হই । ইহার জন্য হয়ত তাঁহার কথা-সাহিত্যে (উপন্যাসে) দেহগত চেতনা, হৃদয়াবেগ, তত্ত্ব-চিন্তা, জটিল তর্ক-বিতর্ক, মননবৃত্ত, দেহ ছাড়া, আধ্যাত্মিক অভীপ্সা সবকিছুই ঠাঁই পাইয়াছে — এই দিক দিয়া তিনি বাঙ্গালা উপন্যাসের পূর্বসূরীদের

ধারাকে অনেকাংশে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন — "The proper stuff of fiction does not exist ; everything is the proper stuff of fiction ; every feeling, every thought, every quality of brain and spirit is drawn upon - no perception comes amiss."

আসল কথা হইতেছে 'life in totality' লেখকের মনের শরণে অথবা কোন 'proportion' - এ কোন 'perspective' -এ অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে — ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা। জীবনকে মর্মভেদী দৃষ্টিতে দেখিতে জানিলে জীবনের অনেক আপাত অনাবশ্যক (রস-বস্তুর বিচারে) বিষয় উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইতে বাধা নাই। আধুনিক উপন্যাসের 'প্রকৃতি' সম্ভবত এইরূপ হইয়া উঠিবে — আর ইহার গতিধারায় জীবনের বিচিত্র স্পন্দন জাগিয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। 'বহুবল্লভ' উপন্যাসের প্রস্তাবনায় দিলীপ কুমার লিখিয়াছেন — "প্রতীতি অনুভব চিন্তা লোকের যত গভীরতর হ'বে - ললিত সৃষ্টিতে তারা ততই খিলোবে গভীরতর রস দীপ্ততর চেতনা।" দিলীপ কুমারের কথা-সাহিত্য (উপন্যাস) সম্বন্ধে এই প্রত্যয় ও সংকল্প তাঁহার রচনায় স্পষ্ট। তাঁহার রচিত উপন্যাসের শিল্প-মূল্য যাহাই হউক না কেন উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও রীতি সম্বন্ধে এই নবীন ভাবধারাটি অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মানুষের 'অন্তর্মুখী' জীবন ও ব্যবহারিক জীবন উভয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনে তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রয়াস স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের সূচনা করে — এইদিক দিয়া তিনি বাঙলা উপন্যাসের দিগন্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হইবে না। সাহিত্যে প্রথা-সিদ্ধ ভারতীয় নৈতিকতাবোধ দিলীপকুমার সচেতন ভাবেই যেন লঙ্ঘন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কথা-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে রোমান্টিক ব্যঞ্জনা প্রেম বিষয়ে দুর্লক্ষ্য নয়। আধুনিক শিক্ষিত নর-নারীর জীবন বৃত্তের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাকে অতিমৃদু রোমান্টিক কবি কল্পনা ক্রিয়াশীল — আর নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিসারের পরিবেশও বেশ রোমান্টিক রস-সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপন্যাসের 'বাস্তবতা' যেন কল্পলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকাংশে 'ক্লাসিক' দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন- সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলিকে কল্যাণাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া অতিক্রম করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। দিলীপ কুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় ও ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ও রোমান্টিক - 'সমাজ-বিমুক্ত'।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪ - জীবিত)

বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবনিষ্ঠ জীবন সমস্যার প্রাধান্য
(অন্নদা শঙ্কর রায় (১৫ই মার্চ, ১৯০৪ খ্রীঃ)

শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায় উড়িষ্যা রাজ্যের ঢেন্কানালে ১৫ই মার্চ, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের শিক্ষালাভ উড়িষ্যার কটকে হয়। বাল্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ কালে রূপকথা, গল্প-কাহিনীর প্রতি এক দুর্বার কৌতূহল ও আকর্ষণ জন্মায়। রূপকথার রাজ্যের কল্পলোকে বালক অন্নদাশঙ্করের মন অজানা দেশের সৌন্দর্যালোকে পাড়ি দিত। শৈশব হইতে বেশ ভাবুক ও গম্ভীর প্রকৃতির মনোভাব তাঁহার ছিল। মনোভঙ্গী ছিল অনেকটা বিশ্লেষণ-মুখী। ছোটবেলা হইতেই তিনি অন্তর-মুখী ছিলেন। কি ও কেন ? এই জিজ্ঞাসা তাঁহার আশৈশবের অভ্যাসগত স্বভাব। যে গুণটি তাঁহার শৈশবে ছিল তাহা হইতেছে সত্যানুসন্ধান। এই সত্যানুসন্ধান তাঁহার অদ্যাবধিও অব্যাহত আছে। অন্তরে অন্তরে সত্যসন্ধ ও নৈরাজ্যবাদী। তাঁহার মনোজগৎ ও ভাবজগতের সহিত বস্তুজগতের বাস্তব জগতের নিয়ত প্রবহমান একটি সূক্ষ্ম-সম্পর্ক আছে। এই দোটানা তাঁহার সাহিত্য-কৃতিতেও দুর্লক্ষ্য নয়। পাটনা ও লন্ডনে শিক্ষালাভকালে বিদেশী গল্প উপন্যাস- নাটক প্রভৃতির এক আশ্চর্য ভাণ্ডারের প্রতি তাঁহার অদম্য উৎসাহ দেখা দিল। লন্ডনে বাস করিবার সময় "কনটিনেনট্," ভালো করিয়া চোখে দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া নানা বিচিত্র নর-নারীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটি নূতন ভাব-পরিমণ্ডল তাঁহার মনের গহনে ঘরকন্না করিতে আরম্ভ করিল। "পথে-প্রবাসে" (১৯৩১ খ্রীঃ) ইহারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত সাহিত্যকৃতি অন্নদাশঙ্করের ওড়িয়া ভাষায় কিছু রচনা আছে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের সময় 'পথে প্রবাসে' য়ুরোপের সেই ছাত্রাবস্থারই পটভূমিতে রচিত।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী কার্যে রত ছিলেন। সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে সরকারী চাকুরী হইতে (১৯৫১ খ্রীঃ) মাঝান্তরে গিয়া সাহিত্য সাধনা করিবার জন্য অকালে অবসর গ্রহণ করেন। পশ্চিমবাংলা সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারী ছিলেন।

সরকারী কর্মে নিযুক্ত অবস্থায় গান্ধীর আদর্শ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্তরে অন্তরে নৈরাজ্যবাদী হওয়াতে গান্ধী-ভাবিত "রামরাজ্যের" তত্ত্বটি তাহার ভালো লাগিয়াছিল। একবার গান্ধীকে জীবন-দর্শনের গুরু করিয়াছিলেন, পরে গান্ধীকে পরিত্যাগ করেন। আবার গান্ধীকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধী হত্যার পর তাঁহার অহিংস নৈরাজ্যবাদ' - প্রত্যয়ে চিড় ধায় — আধুনিক সভ্যতার ভালো-মন্দ গ্রহণ-বর্জন পরীক্ষানিরীক্ষার বিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হইতে হইতে পূর্ণ মন্দকে অতিক্রম করা সম্ভব; এই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছিল। অন্নদাশঙ্কর মনে করেন — আধুনিক সভ্যতার অন্তরে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন নতুবা ইহার স্থির মৃত্যু অবধারিত।

আধুনিক সভ্যতার বিরোধী অন্নদাশঙ্কর নন। গান্ধী ও টলস্টয় কেউ আধুনিক সভ্যতায় বিশ্বাস করিতেন না। আধুনিক সভ্যতার কিছু মন্দ (Evil) আছে আবার কিছু ভালোও আছে, যা সত্যই উৎকৃষ্টতর যা অনন্য তুলনারহিত। আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের মনোভাব উদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট — "এই মার্গই বিবর্তনের মার্গ। এই মার্গে চলতে চলতে আমরা মন্দকে অতিক্রম করতে পারি। যন্ত্রপরায়ণ, নাগরিক, প্রকৃতির সঙ্গে যুধ্যমান, দুর্বলের যম, নির্মমভাবে হিংস্র এই সভ্যতা নিজের হাতেই মরবে, যদি না এর অন্তরের পরিবর্তন হয়। তা বলে এর কীর্তিগুলো কেবলমাত্র আধিভৌতিক নয়। আধ্যাত্মিকও বটে। এ সভ্যতা আমাদের বহু পরিমাণে দিয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা। বহু পরিমাণে দিয়েছে অভাব থেকে, উৎপীড়ন থেকে, অতীত-উপাসনা থেকে, পারলৌকিকতা থেকে, সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি। বহু পরিমাণে সাম্য, বহু পরিমাণে জ্ঞান। বহির্বিশ্বের জ্ঞান তো বটেই, অন্তর্জগতের জ্ঞানও ৷ সত্যই যে ভগবান, এটি আধুনিক সভ্যতারই দান। এমন কি অহিংসার নতুন ব্যাখ্যাও আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে। টলস্টয় ও গান্ধী উভয়েই আধুনিক সভ্যতার সন্তান। অমিতও। কিন্তু সজ্ঞানে।"[২৮]

অন্নদাশঙ্কর দেশের ও বিদেশের সাহিত্য অনেক পড়িয়াছিলেন। চণ্ডিদাস ও বৈষ্ণব কবিতা তাঁহার বড় ভালো লাগিত। বৈষ্ণব প্রেম কবিতা তাঁহার মনে প্রেম সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক না হউক আত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। প্রেম মানুষকে Self realisation - এর পথে আগাইয়া দেয় — মানুষ তাহার অন্তরের শক্তি ও

সৌন্দর্যের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারে । প্রেম সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের ধারণা গান্ধী-টলস্টয় ভাবিত মানব-প্রেম নয় বরং আরো কিছু বিশেষ – যেমন অন্নদাশঙ্কর বুঝিয়াছেন পুরুষের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম । টলস্টয় সারা জীবন নর-নারীর প্রেমের সন্তোষজনক সমাধান খুঁজিয়াছেন, কিন্তু ব্যর্থ গান্ধীও ব্যর্থ । গান্ধীও টলস্টয় নারীকে চিনিতেই পারেন নাই । অন্নদাশঙ্কর বিশ্বাস করেন (১৯৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত) নূতন সমাজ ব্যবস্থায় মানব-প্রেম ও নর-নারীর প্রেম সমান গুরুত্ব পাইবে ।

সবুজ-পত্রে প্রমথ চৌধুরী যেমন বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি-তর্কে শানিত ঋজু ভঙ্গীমায় আধুনিক বিদগ্ধ মনের প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই ধারাই যেন সচেতনভাবে অন্নদাশঙ্করের গদ্য লেখায় অনুবর্তিত হইয়াছে । এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সবুজ পত্রের লেখক হইবার তাঁহার সৌভাগ্য হয় নাই । সবুজ পত্র প্রকাশ কালে অন্নদাশঙ্করের বয়স দশ বৎসর । সবুজ-পত্র প্রথম প্রকাশ হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৯১৪ খ্রীঃ) । আর অন্নদাশঙ্করের জন্ম ১৫ই মার্চ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ । 'সবুজ-পত্র' প্রথম প্রকাশ কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৩ বৎসর (জন্ম ১৮৬১ খ্রীঃ) কবি য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন । এই সময় সীমায় বঙ্গ সাহিত্যে রবীন্দ্র সংস্কার ও ভাবধারা বিদগ্ধ বাঙালীর ভাবনায় ও মনে বর্তাইয়াছে । য়ুরোপের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব বাঙালী লেখকের মনে-প্রাণে নূতন-রস পিপাসা জাগাইয়াছিল । রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ), বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) সন্ত্রাসবাদ, অরবিন্দ ও তাঁহার সহকর্মীর গোপন-আন্দোলন, তৎপরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় - গান্ধীর ভূমিকা - সাম্প্রদায়িকতা ও বিপর্যয় অন্নদাশঙ্করের চিত্তে রেখাপাত করিয়াছিল । এবং এই রেখাপাতগুলি এতই স্পষ্ট যে উপন্যাস গল্প ও ছড়া প্রভৃতিতে ইতস্তত আত্মগোপন করিয়া নাই বরং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে বাজের সুর মিশ্রিত ঝাঁঝালো ।

তাঁহার মননের পরিচয় আছে পদ্যে, গদ্য রচনায় (প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনী) গল্পে ও উপন্যাসে । ভ্রমণ-কাহিনীতে তাঁহার গদ্য-শৈলী প্রশংসনীয় । 'জাপানে' (১৯৫৯ খ্রীঃ) ও য়ুরোপের চিঠি (১৯৪৩) তুলনামূলক বিচার করিলে 'জাপানে' রচনাটি অনেক বেশী সুলিখিত ও পরিপক্ক হাত ও মননের পরিচয় বহন করে । আর 'পথে-প্রবাসে' (১৯৩১) লেখকের শিক্ষানবিশী পর্বের রচনা পরিণত মুন্সিয়ানার অভাব লক্ষ্য করা যায় ।

জাপানে (১৯৫৯) ভ্রমণ-কাহিনীর সূত্রপাত হয় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে যখন আন্ত-র্জাতিক P.E.N. কংগ্রেসের ভারতীয় (বাংলাভাষায়) ডেলিগেট হিসাবে তিনি জাপান যাত্রা করেন । ঠিক ঐ সময়ই তাঁহার দুরূহ উপন্যাস "রত্ন ও শ্রীমতী" লিখিতে লিখিতে খেই হারাইয়া ফেলিতেছিলেন । "রত্ন ও শ্রীমতী" লিখিতে লিখিতে কলম থামিয়া যাইতেছিল – হয়ত জীবনের জগতের মানব-প্রকৃতির ও মানব-নিয়তির সব অভিজ্ঞতা তখনও স্বীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই অথবা অন্য কোন দুর্জ্ঞেয় কারণ যাহা লেখক স্বয়ং সচেতন ছিলেন । উদ্ধৃত অংশে ওই সময়ে লেখকের মনোভাব কি ছিল সহজেই অনুমান করা যায় –

"রত্ন ও শ্রীমতী" লিখতে লিখতে কলম কেবলি থেমে যাচ্ছিল । মন বলছিল সত্যই যথেষ্ট নয়, সৌন্দর্যও চাই । কেবল বহিঃসৌন্দর্য নয় । অন্তঃসৌন্দর্য । সৌন্দর্যের দীক্ষা যে পূর্বে কোনোদিন হয় নি তা নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অভিষেক জাপানে গিয়েই হলো ।"[১৯] এই ভ্রমণের প্রত্যয় হাতে হাতে ফল হইল এই যে "রত্ন ও শ্রীমতী" উপন্যাসের রাজ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করিতে করিতে যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহা idea হিসাবে চিত্তাকর্ষক কিন্তু এই idea রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'-র মত চিরকাল লোকের বহির্জগতে বিরাজ করিবে – শেলীর 'স্কাইলার্ক' যেমন ভাব ও সৌন্দর্যের প্রতীক এও তেমনি মনে । অন্তত 'শ্রীমতী' তো বটেই ('রত্ন ও শ্রীমতী') ।

অন্নদাশঙ্কর উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী থাকার কাল হইতেই পরাধীন ভারতে মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবা ভাবের আদর্শে ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হন । বিবেকানন্দের বাণীও তাহাকে বাস্তব জীবনে অনেকখানি প্রেরণা জোগাইয়াছিল । সাধারণের কথা সচেতনভাবে ভাবিবার ও তাহাদের জন্য কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব কিনা অন্নদাশঙ্করের জিজ্ঞাসু মনে দেখা দিয়াছিল । ভারতের অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের অন্তরে শ্রীঅরবিন্দের মত দৃঢ় প্রত্যয় ছিল । এই প্রসঙ্গে তাঁহার স্যাটায়ারধর্মী কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা হইল – "

"তেলের শিশি ভাঙলে পরে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো – – – – ।"

সমসাময়িক রাজনীতির ঝাঁঝালো মন্তব্য, ঝাঁঝের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশ্রিত। শুধু এই কবিতায় নয় "কণ্ঠস্বর" (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের একাধিক গদ্যে ও প্রবন্ধে ভারতের অখণ্ডত্ব স্বীকার করিয়াছেন — অন্তত সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। জাপানে (১৯৫১) ভ্রমণ কাহিনীর ১২-১৩ পৃষ্ঠায় অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে — "যে দেশ এখনো দুই খণ্ডে বিভক্ত ও ছিন্নমস্তার মত আপনার রক্ত আপনি পান করতে উন্মুখ তাকে দুইনামে নামাঙ্কিত করলেই কি সে দুই আত্মার অধিকারী হবে ?"[৩০] ভারতাত্মার অখণ্ডত্ব তাঁহার চেতনায় দৃঢ়মূল ছিল। অন্নদাশঙ্করের চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বের লিখিত উপন্যাস গল্প বা অন্য রচনা আর চল্লিশ বছর বয়সের পরের রচনা গল্প - বা উপন্যাস বা অন্যান্য রচনায় বেশ সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লেখকের নিজস্ব স্বীকারোক্তি — "চল্লিশ বছর বয়স যখন হলো তখন দেখলুম আমাকে লিখতেই হবে সব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে ব্রহ্মাস্বাদের জন্যে, মুক্তির জন্যে। এ ব্রহ্মাস্বাদ শুধু শিল্পী বা কবিদের পক্ষেই সম্ভব। এ মুক্তি শুধু সুফীদের জন্যে। ধ্যানের দৃষ্টিতে রসের সৃষ্টি করিতে চাওয়া।

"সেসময় আমার প্রতীতি হলো যে আমার আসল কাজ কবিতায়। কবিতা না লিখলে আমার ব্রহ্মাস্বাদ বা মুক্তি পরিপূর্ণ হবে না। কিন্তু তার আগে আমাকে উপন্যাসের পাট চুকিয়ে দিতে হবে। উপন্যাসের কাজ কমিয়ে আনতে হবে। যা না লিখলে নয় তাই লিখে বাকীটা অলিখিত রেখে যাব। নইলে আমার কবিতা হবে না।"

একদিন কবিতা লিখব বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলুম। কিন্তু দেশের জীবনে এলো ঘোর দুর্দৈব। এর জন্য আমি তৈরী ছিলুম না। উপন্যাস লেখা বার বার পিছিয়ে যেতে থাকল মনের অপ্রবৃত্তি থেকে। এখন প্রবৃত্তি হয়েছে। এখন এক নিঃশ্বাসে উপন্যাস লিখতে চাই। দশ রকমের ফরমায়েশী লেখার জন্যে সময় বা শক্তি বা অভিরুচি নেই। লেখা যাঁরা চান তাঁরা নিরাশ হলে আমি নিরুপায়। উপন্যাস হতে সাত-আট বছর লাগবে। মাঝে মাঝে দম নেবে। সেই ফাঁকে কিছু কিছু অন্য লেখা লিখতে পারি। কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ করে নয়। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।"[৩১]

অন্নদাশঙ্করের রচনায় (গল্প ও উপন্যাসে) দেশ-কাল-পাত্রের একটি প্রতিবেশ আছে। এই ত্রয়ীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও রচনায় দুর্লভ নয়। এদেশের আধুনিকতার অনেকটাই যে পশ্চিম দেশের তথা য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস সমাজনীতি ও অর্থনীতির নূতন ফসল হইতে আত্মসাৎ করা। এই পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে ইংরেজের সংস্পর্শে, ইংরেজের শাসন কালে - উনবিংশ শতক হইতে। সেই ধারাই বিংশ শতকে বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া ধাবিত হইল, নানা নূতন, রুচি, চিন্তা, ধ্যান ধারণায় সূত্রপাত করিল। অন্নদাশঙ্কর মনে হয় ভারতীয় বা এদেশীয় ধারার সাহিত্য পাশ্চাত্যের সমন্বয় - আধুনিকতার সহিত ঐতিহ্যবাহী ধ্যান ধারণার একটি শোভনযোগ্য সমন্বয় সাধনে ব্রতী আছেন। সত্যানুসন্ধানী অন্নদাশঙ্কর, সৌন্দর্যানুসন্ধানী ঔপন্যাসিক হইয়া ক্ষান্ত হন নাই শিবকে (কল্যাণ) খুঁজিয়া ফিরিতেছেন — বিপর্যস্ত মানবিকতার অবমূল্যায়নে এই কল্যাণকে মানবজীবনে সুস্থভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা ? ইহাই বোধ করি তাঁহার জিজ্ঞাসা। এই শিব (কল্যাণ) মানবপ্রেম বা প্রীতি বা মৈত্রী ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস তাঁহার মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস দিনদিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। একটি চরম অবিশ্বাস যেন মানবসভ্যতাকে গ্রাস রোধ করিয়া পৃথিবীর দেশে-দেশান্তরে ফিরিতেছে। বিশ্ব আজ আনবিক শক্তির চরম-উৎকর্ষে উন্নীত হইয়াও দেশে দেশে মানুষে মানুষে মানবপ্রেম- পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের একটি বিশেষত্ব মানবনিয়তি, মানবপ্রকৃতি, মানবপ্রেম ও নরনারীর প্রেম। আর সামাজিক অন্নদাশঙ্কর ও সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর এই উভয় সত্তাই তাঁহার মধ্যে বিরাজমান। কখনো একটি ভাবপ্রবল হয় তখন আর একটির প্রভাব দুর্বল। তবে "রত্ন ও শ্রীমতী"-র তৃতীয় ভাগ রচনার সময় "সামাজিক-আমি"র ভারমুক্ত হইয়াছিলেন সজ্ঞানে। এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া 'রত্ন ও শ্রীমতী' রচিত দীর্ঘ সময় ধরিয়া বহু চিন্তনের ও বহু অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত।

অন্নদাশঙ্করের চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে যে রচনা বিশেষ করিয়া উপন্যাসগুলিতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য পিপাসা বা রসমূর্তি সৃষ্টির জন্য লিখিত হয় নাই। প্রীতির সংযোগ হয় নাই, মানবপ্রকৃতির বিশেষ কতকগুলি দিক মাত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে — যাহা পরিবেশ ও স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল — চিরন্তন মানব প্রকৃতির রহস্য ধরা পড়ে নাই। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য তথা য়ুরোপের আধুনিকতার যুক্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য সমন্বয় খুঁজিতেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে রচনাগুলিতে প্রকারান্তরে এই সত্যই স্পষ্ট হইয়া

উঠে যে লেখক মনে প্রাণে শিক্ষায় দীক্ষায় য়ুরোপীয়, কিন্তু য়ুরোপের কোনো একটি পরীক্ষামূলক চিন্তাধারার মধ্যেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাকুলভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে শেষ সমাধান খুঁজিয়া ফিরিতেছেন । এখনও তিনি সমাধান খুঁজিয়া পান নাই । জাপানে (১৯৫৯) ভ্রমণকাহিনীতে তিনি — লিখিয়াছেন — ওই একই কথা —

"There can be no great art or literature unless a solid foundation is laid in truth and love ... India's age-old pre occupation with the eternal verities with the first and the last things, will never take a secondary place or fade away. The best that is in her is permanently attuned to these verities ... The inherent contradictions between the modern way and the Gandhian way will increasingly come to the fore. Writers will perhaps be freed to make choice between the two and it will be an agonising choice to make either way. Western writers have no such agony ahead of them. Here we have to carry the masses with us one way or the other or become completely inconsequential." - Annada Sankar Roy P-39 (জাপানে) [৩২]

এই সমস্যা কেবলমাত্র অন্নদাশঙ্করের সম্মুখে সত্য নয় তাবৎ লেখককুল সম্মুখেও সত্য । বর্তমানে যাঁহারা উপন্যাস বা গল্প লিখিতেছেন তাঁহারাও সচেতনভাবেই এই দ্বিধায় পড়িয়াছেন ।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্করের একটি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস লক্ষ্য করা যায় । এই অভ্যাসটি অতিকথন ও কাহিনীর অনাবশ্যক বিস্তার । রবীন্দ্রনাথ একদা অন্নদাশঙ্করকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়াছিলেন । উদ্ধৃত অংশে অন্নদাশঙ্করের নিজের স্বীকারোক্তিতে ওই অভ্যাসটির উল্লেখ আছে — " আমার তখন চাকরির ঝামেলার উপর বৃহৎ উপন্যাসের ঝঞ্ঝাট । আমি তো কেবল কাহিনী বলে খালাস হইনে, বাক্যের পর বাক্য বানাই । বাক্য ঠিক না হলে আমার লেখাই এগোয় না । একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, অমন খুঁতখুঁত করলে তুমি কোনোদিন ঔপন্যাসিক হবে না, উপন্যাস লেখার রীতি ও নয় ।" [৩৩] পরিণত বয়সের রচনায় অন্নদাশঙ্করের এই অভ্যাসটি আরও প্রসার লাভ করে । রত্নী রনী রচনায় এই ঢিলেঢালা জিরাইয়া জিরাইয়া গল্প-রচনার ত্রুটি বর্তমান ।

অন্নদাশঙ্করের বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন 'অসমাপিকা' (১৯৩০) উপন্যাস রচনা করেন। ইহাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলিয়া উপন্যাসের খসড়া বলাই শ্রেয়। এই সময় তিনি সদ্য বিলেত-ফেরৎ সিভিল সার্ভেন্ট' কন্টিনেন্ট ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তারুণ্য' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এদেশের ব্রহ্মচর্য বা সতীত্বের আদর্শ এবং স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁহার মতে এই দুইটি আদর্শ মানুষের জৈবিক প্রকৃতি ও শরীর ধর্মের পরিপন্থী; প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দেহ এবং মনের স্বাভাবিক বিকাশকে কতিগ্রস্ত করিবার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নাই। এই আদর্শ অনুসরণ করিবার ফলে দেশের তারুণ্য-শক্তি খর্ব হইতেছে। তাঁহার মতে অন্তত তারুণ্যে যে বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে — তিনি মনে করেন সমাজের নৈতিক মান উন্নত না হইয়া ব্যভিচার ও নোংরামি পূর্ণ হইতেছে। 'পথে-প্রবাসে' (১৯২৮ খ্রীঃ) ভ্রমণ-কাহিনীমূলক গ্রন্থে য়ুরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে য়ুরোপের কর্মোদ্যম সক্রিয়তা ও প্রাণ-প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এদেশের নিষ্ক্রিয়তা ও নিবীর্যতা ও ভগ্নোদ্যমকে ধিক্কার দিয়াছেন। য়ুরোপের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার জৌলুস ও গরিমা তরুণ অন্নদাশঙ্করকে মুগ্ধ করিয়াছিল সত্য কিন্তু তাঁহার অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারে নাই — এই পিপাসা মনুষ্যত্ব-বোধের ও মানবপ্রেমের। চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বের উপন্যাসে অর্থাৎ প্রথম দিককার উপন্যাসগুলিতে এই মনোভাব স্পষ্ট। অন্নদাশঙ্কর কণ্ঠস্বর গ্রন্থে লিখিয়াছেন — "যুগ আমার জনক। দেশ আমার জননী। উভয় ধারাই আমার সৃষ্টিতে (গল্পে-উপন্যাসে) থাকবে। উভয়েরই প্রতিই আমার আকর্ষণ।" .... বাংলার মাটির টান।"[৩৪]

অন্নদাশঙ্কর বুদ্ধিপ্রধান ঔপন্যাসিক। এই শ্রেণীর লেখকের রচনা (গল্প-উপন্যাস-কবিতা বা ছড়া) হয় রসধর্মী হইবে নতুবা বক্তব্য-প্রধান হইবে: অন্নদাশঙ্কর প্রথম দিকে রসাত্মক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এবং চল্লিশ বছর বয়সের পর অর্থাৎ পরের দিকে মনন-ধর্মী বক্তব্য প্রধান রচনায় হাত দিয়াছিলেন সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু লেখক হইয়াছেন। রসাত্মক উপন্যাস রচনায় তিনি বাস্তবানুগ সাধারণীকরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ রচনার মূল যেন মাটি হইতেই বাস্তব হইতেই দেশ-কাল-পাত্র হইতেই বৃদ্ধির রস আহরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে — এইখানেই রাজশেখর বসু ও জ্ঞানাথন মুইরহেটের সঙ্গে তাহার পার্থক্য। এই শ্রেণীর রসাত্মক রচনায় ভাষা পরিচ্ছন্ন সাবলীল,

শহুরে, কচিৎ দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দ একই শব্দের দুইবার দুই অর্থে ব্যবহার বিরোধাভাস প্রভৃতি অলঙ্কার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাহুল্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। অন্নদাশঙ্করের পর্যবেক্ষণ শক্তি অসাধারণ ও তিনি নির্মম বিচারক তীক্ষ্ণ লেখকের চোখে কিছুই এড়াইয়া যাইতে পারে না। 'অসমাপিকা' উপন্যাসটিতে বার্নার্ড শ' লিখিত ' The Irrational Knot ' বইখানির প্রভাব থাকিতে পারে। তবে বিবাহ ও প্রেম এই দুয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য লইয়া তাহার পরবর্তী উপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছে। 'অসমাপিকার' কাহিনী হইতেছে আধুনিক মনোভাবাপন্ন নায়ক সুচারু সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রেমজ বিবাহ করিল সুরুচিকে। বিবাহ অন্তে তাহার অভিলাষ হইল যে সে আপন ঔরস জাত সন্তানের পিতা হইবে। এই অনাধুনিক কামনা পূর্ণ হয় নাই কারণ সুরুচি অপরের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা। এই সত্য উদ্‌ঘাটনের পর সুচারুর আধুনিকতার মুখোস খুলিয়া পড়ে তাহার মনে (সুচারুর) যুগ যুগ সঞ্চিত নারীর সতীত্বের সংস্কার জাগিয়া উঠিল। সুচারুর ব্যবহারে রূঢ়তা প্রকাশ পাইতে থাকিল। বিবাহ-সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এই হিন্দু ধারণা অযৌক্তিক। শিশুকন্যাকে সঙ্গে লইয়া সুরুচি পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। মনে রাখিতে হইবে তখন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট আইন পাশ হয় নাই হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, কারণ হিন্দু-বিবাহ " Sacrament "। মনে হয় বিবাহ-বন্ধনের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অন্নদাশঙ্কর কালের পরিবর্তনের মানুষের রুচির পরিবর্তনের ভাবী পূর্বাভাস দিয়াছেন ব্যঙ্গাত্মক এই উপন্যাসে। 'অসমাপিকা' ঠিক উপন্যাস নয় - প্রহসন জাতীয় রচনা। বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক দিয়া ইহা যেন সামাজিক মানসের তৎকালীন সূক্ষ্ম রেখা-চিত্র। যেখানে সমাজ মানসে এক কোটিতে 'modernisation' অপর কোটিতে 'traditional' সমাজ-চেতনা। এই উভয় ধারার সমন্বয় হয় নাই। সুচারু-সুরুচির প্রণয়-লীলায় পারিবারিক ও সমাজচেতনার দিকটি লেখক কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন। মনস্তত্ত্বমূলক কোনো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রচেষ্টা গ্রন্থটিতে অনুপস্থিত – ভাষায় শ্রী ও বাক্যগঠনেও সৌষ্ঠব বর্তমান। 'অসমাপিকা' গ্রন্থটিতে যে কাহিনী তাহাতে যেন লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রীঃ) এক ইংরেজ তরুণীর সহিত বাঙালী যুবক সোমের চটুল প্রেমাভিনয়ের কাহিনী।[৩৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের মানস-

প্রকৃতির পরিবর্তন কবি চিত্তে তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, গল্প-উপন্যাসে ইহার প্রতিফলন প্রভৃতি প্রবাসী লেখক-চিত্তে স্পন্দন তুলিয়াছিল। অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে য়ুরোপের জ্ঞান-বিনিময় গ্রন্থের মাধ্যমে নয় — প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সচক্ষে তিনি য়ুরোপ দেখিয়াছেন উপলব্ধি করিয়াছেন। এলিয়ট প্রমুখ ইংরেজ কবির কবিতায় যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের, ইহার সামাজিক ও মানসিক দিকটির অভ্যন্তরের দিকটির ইঙ্গিত বহন করিতেছে - The Waste Land' (1922) কবিতাটি উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে। রণজর্জর য়ুরোপ কর্মভারক্লান্ত। যন্ত্র ও যন্ত্রাধিপতি নিরুদ্বেগ জীবনকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। মানবিকতাবোধ ও নরনারীর মধ্যে নৈতিক সংযম ধীর গতিতে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এইসব ক্ষেত্রে শাশ্বত মানবিক গুণও (যেমন প্রেম, দয়া ইত্যাদি) সুকুমারবৃত্তিগুলি ক্ষণস্থায়ীত্ব লাভ করে। এই পরিবেশে নর-নারীর মধ্যে প্রেম বিকশিত হয়, কোন কারণে হয়ত রূঢ় বাস্তবের আঘাতে সেই প্রেমের মুকুল ঝরিয়া পড়িয়া যায়। আমার মনে হয় 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রীঃ) গ্রন্থটিতে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনীয় হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) পৃথিবীতে জীবনের গতিবেগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গতিবেগ অনেক ক্ষেত্রে জীবনের ভার-লাঘব করায় - মানুষ অনাবশ্যক বন্ধনে ভারাক্রান্ত হইতে বিমুখ। তাই স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-দয়া-মায়ার ব্যাপারেও মানুষ হিসাব করিয়া বাস্তব-চেতনার পরিচয় দেয়। তাই হয়ত নরনারীর প্রণয়-লীলাও ভার-মুক্ত ক্ষণস্থায়িত্ব লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিপূর্ণ — "এ যেন গৃহ ছাড়িয়া পথেই বাসর-শয্যা পাতা। এই সম্পর্কের ক্ষণিকতাই ইহাকে একটি করুণ, মধুর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করে — সপ্তাহান্তের সম্বন্ধটি জীবনে স্থায়ী করা যাইবে না বলিয়া ই একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই পলাতক প্রেম-চাঞ্চল্য, বিচিত্র বর্ণ প্রজাপতির মত চোখের উপর একটা রং-এর হিল্লোল খেলাইয়া অন্তর্হিত হয়। হাস্যপরিহাসপূর্ণ, রসিক কথাবার্তার মধ্য দিয়া সুনিপুণ প্রেম নিবেদন এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ।"[৩৬] বিশ্লেষণ ও চরিত্রসৃষ্টির কোনো চেষ্টা নাই — সোম ও পেগি আধুনিক যে কোনো তরুণ-তরুণীর প্রতিনিধি। সোম ও পেগি-র চরিত্র 'সৃষ্টি-কার্য' নয় 'আবিষ্কার-কার্য'। যে কোনো তরুণ-তরুণী ইহাদের মত আচরণ করিতে পারে — এবং ইহাই স্বাভাবিক। এই পর্যায়ের চল্লিশের পূর্বের উপন্যাস লেখকের হাত পরিপক্ক হয় নাই — জীবন সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক স্থির-প্রত্যয়ে উপনীত হইতে পারেন নাই মনে হয়। পুরাতন ঐতিহ্য ও নূতন ঐহিকতা এ দুইয়ের মধ্যে দোটানাভাব দুর্লক্ষ্য নয়

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে । 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রীঃ) সোম ও পেনির মধ্যে ভালোবাসার যে লীলা-প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় তন্মধ্যে অভিমান ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া পারস্পরিক আকর্ষণের ক্রমপরিণতির স্তর চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের গুরুত্বহীনতাই লক্ষণীয় । পরিশেষে গ্রন্থখানিতে সোম ও পেনির বিবাহের সম্ভাব্যতার আশাবাদী আলোচনায় গ্রন্থের আকস্মিক পরিসমাপ্তি । একান্তভাবেই বলা উচিত যে – "পথের রোমান্স (romance) ঘরের ধরাবাঁধা রুটিনে পর্যবসিত হইবার পূর্বেই ধূসর অনিশ্চয়তায় মিলাইয়াছে ।"[৩৭] এই গ্রন্থখানি লিখিবার সময় অন্নদাশঙ্কর সরকারী চাকুরীরত । বয়স ছাব্বিশ (২৬) বছর । বহু দ্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি যদি মর্মভেদী হয় তবে স্রষ্টা রসোত্তীর্ণ ধ্যানমূর্তি সাহিত্যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম । এই অন্তর্দৃষ্টির জন্য বড় প্রয়োজন স্থির বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনা- ভালো - মন্দের মধ্যেও অমন্দ ভালো যেমন প্রয়োজন জীবনে তেমনি অজানা মন্দরও প্রয়োজন তদপেক্ষা কোন অংশে কম নয় – বরং পরস্পর পরিপূরক । জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে ইহার সার্থকতা আছে । 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রীঃ) প্রহসন জাতীয় উপন্যাসের খসড়ায় মানব জীবনের বৃহত্তর পরিধি ও গভীরতা অনুপস্থিত । জীবনের উপবিভাগের মানবজীবনের কতকগুলি সাময়িক চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তির আবেগ সমষ্টির মধ্যে অন্নদাশঙ্কর জীবনের **moments of truth** যেন আবিষ্কারের প্রয়াসী হইয়াছেন । কিন্তু এই **truth** ঘাতসহ নয় । ক্ষীণজীবী অতি দুর্বল । মানব জীবনের বহুমুখী গতিচাঞ্চল্যের ভার-বহন ক্ষম নয় । তাই পথেই মৃত্যু । পথেই শেষ । এই শ্রেণীর প্রণয়-লীলার ইহাই শোভনযোগ্য পরিণাম ।

"অন্নদাশঙ্করের 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩ খ্রীঃ) আগুন নিয়ে খেলা-র (সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রীঃ) শেষাংশ রূপে গণ্য হইতে পারে ।"[৩৮] আগুন নিয়ে খেলা' গ্রন্থখানির নায়ক সোম 'কেতা দুরস্ত' সাহেব বলিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । দেশজ সংস্কার ও হিন্দুয়ানীর ঐতিহ্য সজ্ঞানে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে – অর্থাৎ মনে প্রাণে 'ফ্রিম্যান' –'মুক্তপুরুষ' (সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন হইতে) হইতে চাহিয়াছেন অন্তত তাহার বক্তব্যও আচরণে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক । সোম পাত্রী-নির্বাচন-উপলক্ষে কয়েকটি প্রহসন সৃষ্টি করিয়াছে । 'প্রত্যেক মেয়ের নিকট প্রেম নিবেদন পূর্বে সে নিজ অতীত ইতিহাসের বিবরণ জানাইতে চাহিয়াছে – কিন্তু কেহই এ শর্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই ।"[৩৯] বাঙলা দেশে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে 'কোর্টশিপ' করিয়া বিবাহ

প্রথা দ্বিধা ও সন্দেহের চোখে দেখা হইত। তাই বিলেত-ফেরৎ দামী পাত্র সোমের — "নির্জন সাফল্যের অবসর-প্রার্থনা প্রত্যেক পরিবারেই (রক্ষণশীল পরিবার) তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়াছে।" শিবানী বাঙালী ঘরের মেয়ে স্বাভাবিক পারিবারিক আবহাওয়ায় ও প্রবহমান বাঙালীয়ানা ও ঐতিহ্যধারায় সংস্কার ও রুচিতে বিশ্বাসী। মনে মনে রক্ষণশীল এবং পর-পুরুষ সম্মুখে সন্দেহপরায়ণ — বস্তুত ইহারা কেহই অন্তরে বাহিরে 'ফ্রি' নন — 'ফ্রি ও-ম্যান' তো নয়ই। নারীর ভূষণ লজ্জা ও সংকোচ শিবানীকে এই প্রস্তাবে অর্থাৎ সোমের নিভৃত সাফল্যের প্রস্তাবে জড়পিণ্ডবৎ করিয়াছে। ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী পরিবেশ ও দেশ-কালের আবহাওয়া চাল-চলন, রুচি ও নৈতিকতাবোধ। শিবানীর এই জড়ভাবের জন্য তাহাকে দায়ী করা অনুচিত। শুধু শিবানীই নয়, শিবানীর সধর্মী (বাঙালী মেয়ের ধর্ম, ব্রাহ্ম হইলেও) সঙ্গীতপ্রিয়া সুলক্ষণা, হেডমাস্টার-কন্যা বি.এ. অনার্স অমিয়া, "ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজ-বিহারিণী প্রতিমা", "এবং অসহযোগ - আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা মায়া" প্রত্যেক বঙ্গ ললনা কোন-না-কোনভাবে নিজেদের অন্তরের অনুদার রক্ষণশীল মনোভাব ও সন্দেহপরায়ণতায় পরিচয় দিয়াছে। ইহার জন্য ইহাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। ইহাদের মনের সঙ্গে আছে যুগ যুগ সঞ্চিত বাঙালীর রক্ষণশীলতার অমোঘ প্রভাব। ইহারা যতই শিক্ষা ও আলোক প্রাপ্তা হউক না কেন দেশজ-ঐতিহ্য ও নারীর সংস্কার মুক্তি তত সহজ হইবার নয়। তাই তাহারা কেহই "ফ্রি ও-ম্যান" নয়। তাহারা বন্দিনী নারী। সোম তাহার প্রস্তাবের সক্রিয় সমর্থন লাভ করে নাই।" কেহই ভাবী স্বামী-র (সোম) চরিত্রস্খলনকে উদার সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিচার করিয়া সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। সোমের স্বীকারোক্তি প্রত্যেক নারীই প্রতিবাদ করিয়াছে বিভিন্নভাবে। এই গ্রন্থটিতে অনেক স্থানে "প্রহসনের আতিশয্যে সম্ভাব্যতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রম হইয়াছে।"[80] মোটের উপর 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩ খ্রীঃ) গ্রন্থখানি উপভোগ্য ও সরস। এই প্রহসন লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাসের খসড়াটিতে লীলাচঞ্চল প্রাণ-প্রবাহের সুন্দর পরিচয় আছে। 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩ খ্রীঃ) গ্রন্থখানি রচনার সময় অন্নদাশঙ্করের বয়স ঊনত্রিশ বছর। যৌবনের তুঙ্গে তিনি তখন। যৌবনের ধর্ম গতি ও বন্ধনমুক্তি। গ্রন্থখানিতে লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতামতের প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে — অন্নদাশঙ্করের আড়ালে থাকিয়া চরিত্রগুলিকে আপন স্বভাব ধর্মে বাড়িয়া উঠিতে দেন নাই। মনে হয় তারুণ্য (১৯২৮ খ্রীঃ) গ্রন্থটির ভাব-বীজ তাঁহার মনোধর্মের নিয়ামক হইয়াছে।

চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ থিয়োরির বাহন রূপে চরিত্র ও কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়। লেখক এরপর উপন্যাস রচনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পথ চলিতেছেন। কাহিনী অথবা চরিত্র খাপছাড়া আকস্মিকতার লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে চরিত্রে ব্যঙ্গাত্মক অতি রঞ্জন বর্তমান। য়ুরোপের বন্ধন-মুক্তি ও যৌবন বেগ অন্নদাশঙ্করের অবচেতন মনে গভীর রেখায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জটিল জীবন সমস্যা। ইহার মধ্যে আছে মানব-প্রেম ও নরনারীর প্রেম। আধুনিক জীবনের সমস্যা কত রকমের হইতে পারে। আধুনিক মন কত ভাব-ধারায় পরিপুষ্ট হইতে পারে — জীবনের গতি কত বিচিত্র পথ-অভিমুখী হইতে পারে, মানব-কল্যাণের পরস্পর বিরোধী আদর্শ কিভাবে মানব জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে তাহাই যেন 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-১৯৪২ খ্রীঃ) নামক সুবৃহৎ উপন্যাসের ছয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। 'সত্যাসত্য' ছয়টি খণ্ড বিভিন্ন সময়-সীমায় রচিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়-সীমার যুগ-প্রতিবেশ বিভিন্ন খণ্ডে দুর্লক্ষ্য নয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে নাৎসী জার্মানীর অভ্যুত্থান - হিটলারের সৃষ্ট আতঙ্ক। অশীতিপর বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ রোগ শয্যায় লিখিলেন 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪০-'৪১), ইংল্যাণ্ডের পুরাতন উদারনৈতিক মত - ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ স্বাধীন চেষ্টার জয় ঘোষণা, শ্রমিক, কমিউনিষ্ট ও বলশেভিক আদর্শের যুক্তিবিচার, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্বভৌম প্রয়োগ, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, যুদ্ধবর্জন ও শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বিবাহ বন্ধনের চিরন্তনতা, ইত্যাদি যে সমস্ত চিন্তাধারা যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাপীড়িত মানব মনকে অহরহ আলোড়িত করিতেছে, তাহারা সকলেই এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলিতে, মননশীলতা, ও হৃদয়াবেগের সহিত যুক্ত হইয়া, প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সুতরাং কেবল মননশীলতার মানদণ্ডে উপন্যাসটির স্থান খুব উচ্চে।"[৪১]

মনে হয় ব্যক্তি নিরপেক্ষ মতবাদ আলোচনা ঔপন্যাসিকের চরম উৎকর্ষের পরিচয় নয়। 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-১৯৪২) এপিক লক্ষণাক্রান্ত বৃহৎ উপন্যাসে বাদল, সুধী, উজ্জয়িনী এই তিনটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত সমস্যা আবর্তিত হইয়াছে। ইহারা এই সমস্ত মতবাদ দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে — এই যুক্তিতর্ক সর্বত্র না হইলেও অনেক স্থলে বুদ্ধিগত আলোচনার স্তর ছাড়াইয়া হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতার রূপ ও রঙকে বদলাইয়াছে।[৪২]

তাছাড়া অশোকা তালুকদার, দে সরকার, প্রভৃতি আরও কয়েকটি চরিত্র গৌণ হিসাবে প্রবর্তিত হইলেও হৃদয়াবেগের মৌলিক মর্যাদার দাবীতে গ্রন্থ মধ্যে প্রধানত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাহারা তর্কে যোগ দেয় নাই, কিন্তু যুক্তি-তর্ক প্রতিতর্কের ঝড়ে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই সুবিধা গ্রহণ করিয়া অন্তরের কামনাকে স্ফুরিত ও আবেগ উষ্ণ করিয়াছে।"[৪৩]

'সত্যাসত্য' (১৯৩২ খ্রীঃ - ১৯৪২ খ্রীঃ) উপন্যাসের নায়ক বাদল যেন দোটানায় দ্বিধাগ্রস্ত। সঠিক পথ-অনুসন্ধানের অন্তর অলিন্দে সর্বাপেক্ষা দোলাচল চিত্ত। কারণ তাহার আধুনিক ভাবাগ্র মনন ঐতিহ্যধারা 'সামাজিক আমি' - সত্তার সহিত (ভারতীয় ঐতিহ্য) আধুনিক যুগ পরিবেশের অনিবার্যতাকে সমন্বয় করিয়া যথাপন্থা অবলম্বন করিতে ব্যর্থ। এই সমস্যা লেখকেরও। ইহা কেবল মাত্র অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত সমস্যা নয় প্রথম যুদ্ধোত্তর কালসীমায় এদেশীয় লেখকবৃন্দের সমস্যাও বটে। 'জাপানে' (১৯৫৯ খ্রীঃ) ভ্রমণ-কাহিনীতে আন্তর্জাতিক P. E. N. কংগ্রেসের 'সিমপোসিয়াম'-এ যে বক্তব্য অন্নদাশঙ্কর রাখিয়াছেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই বক্তব্যে একালের লেখক কুলের গূঢ়তম সমস্যার কথা সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমানের লেখকবৃন্দের কী অবস্থা ও সমস্যা - চিন্তনের দিক দিয়া ও আদর্শবোধের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে তাহা নিম্ন উদ্ধৃত অংশের মধ্যে নিহিত আছে। — "We fpund it impossible to reject the Gandhian way. We also found it impossible to reject the modern or for that matter, the Western. Did this-mean that we accepted what we could not reject ? That was also impossible. For one thing we are disenchanted with the modern West, disillussioned after World War I, sickened after World War II. For another we were not sure that in following the Gandhian way we would not undo a century and help of evolution and return to the Middle Ages. There are wild men in India who care nothing for Non-Violence and Truth and whose one object is to good old days of the privileged castes of India. Modernisation is therefore a stern necessity and it must be carried out with a

firm hand. But the means towards this end should not be unfair or evil. Enforced modernisation can not lead to a flowering., of the spirit ...... we are passing through much inner travail. We have the feeling that in the process of modernisation we are moving further and further not only form our enemy, medievalism but also firm our friend, Gandhism .... Great masses of men have been enfranchised. If they in their impatience threw to the winds, their traditional reverence for life and respect for truth, ceasing to distinguish between right and wrong, their country's modernisation will only land it in great disaster. Their rulers should be well-advised to guard against disaster by ruling out violent and untruthful means. On the other hand there should be no undue delay in the evolution of the country. Rapid evolution is the only substitute for revolution while we must not lose our x soul for the world we should not lose the world for the sake of the soul. For a disinherited people long exploited by foreign and indigenous elements this is also necessary. I have tried to give a picture of what is in the mind of the writers of India at the present day. A struggle is in progress in that mind between the modern, the traditional and the Gandhian ways of life. A satisfctory 'modus vivendi' may be worked out some day but what we have to day is an unreal compromise not worthy of serious scrutiny. There can be no greater art or literature unless a solid foundation is laid in truth and love .... Indiads age-old pre-occupation with the eternal verities, with the first and the last things will never take a secondary place or fade away. The best that is in her is permanently attuned to these

verities ... The inherent contradictions between the modern way and Gandhian way will increasingly come to the fore. Writers will perhaps be forced to make a choice between the two and it will be an agonising choice to make either way. Western writers have no such agony ahead of them. Here we have to carry the masses with us one way or the other or become inconsequential."[88]

অন্নদাশঙ্করের এই বক্তব্যের সারবত্তা হইল একালের তাবৎ লেখক (বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে) 'আধুনিকতা' (Modernisation) ও ঐতিহ্যবাহী ধারা (Traditional Past) ও গান্ধীবাদের মধ্যে ' unreal compromise ' করিয়া উপন্যাস-সাহিত্যের পথ-পরিক্রমা করিয়া চলিতেছেন ফলে সাহিত্যের বুনিয়াদ সত্য ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। জীবন যেখানে চঞ্চল - দোটানায় দ্বিধাগ্রস্ত সাহিত্য জীবনের সারভূত ফসল তথাতেও তো ওই লক্ষণযুক্ত থাকিতে বাধ্য - অন্নদাশঙ্করের বক্তব্যের আলোকে বলিতে হয় — "There can be no greater art or literature unless a solid foundation is laid in truth and love ..... India's age-old pre occupation with the èternal verities, with the first and the last things will never take a secondary place of fade away. The best that is in her is permanently attuned to these verities..... "

'সত্যাসত্য' (১৯৩২ খ্রীঃ - ১৯৪২ খ্রীঃ) উপন্যাসখানি এপিক ধর্মী- ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড বিভিন্নকাল পরিবেশে লিখিত। এই সময় লেখক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। চাকুরীর অবসরের ফাঁকে 'সত্যাসত্য' লিখিত হয়। তাই অনেকাংশে চরিত্র ও ঘটনা মূল বক্তব্যের অভিমুখী না হইয়া অনাবশ্যক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, মনে হয় লেখক পাশ্চাত্ত্য ধ্যান-ধারণার মধ্যে কোনো মানবকল্যাণমুখী স্থির প্রত্যয়ের সন্ধান তখনও পান নাই — 'পরশ পাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছেন' — এই সত্যানুসন্ধান 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-১৯৪২) উপন্যাসের মূলকথা। সরকারী কর্মরত অবস্থায় অন্নদাশঙ্কর মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হইয়াছিলেন। গান্ধীর প্রভাব তাঁহার বর্তমান আলোচ্য উপন্যাসের সুধী আত্ম-প্রতিষ্ঠ। সে নানা অভিজ্ঞতার আলোড়নেও নিজ অন্তরের

প্রজ্ঞানুভূতিতে স্থিরতর হইয়াছে। ভারতীয় আদর্শের প্রতিনিধি সুধী। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর ভারতীয় আদর্শের স্থিতিশীলতা ও মননশীলতাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনের সমস্ত মনোযোগ মাধুর্য ও করুণাবোধ বাদলের জন্য সংরক্ষিত। ইহার কারণ সম্ভবত লেখকের অন্তরেই বর্তমান। মনে হয় ভারতীয় আদর্শের প্রতীক সুধী চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি কোনো অভ্রান্ত আদর্শে উপনীত হইতে পারেন নাই অন্তত সুধী চরিত্র-চিত্রণে। সুধী চরিত্র যেন বাদল চরিত্রের পরিপোষক। বাদল চরিত্র ভালো করিয়া পরিস্ফুট করিবার জন্যই সুধীর আমদানী। সুধী 'গোটা মানুষের' চরিত্র নয় – এই চরিত্র পরিকল্পনায় অনেক ফাঁক রহিয়াছে, লেখকের পূর্ণ মনোযোগ পাইলে সুধী চরিত্র অন্যরূপে দেখা দিত। সুধীর ~~[illegible]~~ দৃষ্টিভঙ্গী বাদলের বিপরীত। বস্তুত বাদলের প্রয়োজনেই সুধীকে বিলাতে পাঠানো হইয়াছে। উপন্যাসখানি উদ্দেশ্যমূলক ও তাত্ত্বিক লক্ষণাক্রান্ত। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী – গ্রামের উজ্জীবন, কুটীর শিল্পের প্রাণ-বস্ত প্রসার, গ্রামীন অর্থনীতির পুনঃউজ্জীবন, গ্রামের স্বয়ং নির্ভরতা, পঞ্চায়েত প্রভৃতি কর্মসূচীর প্রবর্তন ইহাই গান্ধীভাবিত আদর্শ। মনে হয় এই আদর্শে গান্ধীর মত সুধীও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল – লেখকের মানসলোকে সচেতন ভাবেই গান্ধীর প্রভাব বর্তমান – সেই উৎস হইতেই সুধীর সৃষ্টি উপকরণ সংগৃহীত। গান্ধীর মতো সুধী ভারতের সনাতন আধ্যাত্মবাদের পুনরুত্থান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ – এই আদর্শে অবিচলিত।

"বাদলকে লেখক দুরূহ সত্যানুসন্ধানের দুঃসাহসিক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছেন দূর দেশে, তাহার খোঁজখবর সংগ্রহ করা তাহার জন্য দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা করা, তাহার অবহেলিত স্ত্রী উজ্জয়িনীর দায়িত্ব নেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য এক কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রয়োজন – এই সব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই লেখকের আদেশে সুধীকে বিলাত যাইতে হইয়াছে। বিলাতে সুধীর কী কাজ, কী বিদ্যা অর্জন, কী তাহার প্রয়োজন, যে আদর্শে সুধী বিশ্বাসী সেই আদর্শের জন্য এইসব কর্ম-উদ্যম একান্তই প্রয়োজন কিনা সব কথা লেখক সযত্নে এড়াই গিয়াছেন। মনে হয় লেখক সুধী যে দৃঢ়চেতা অন্তরের প্রজ্ঞা ও পূর্ব সংকল্পে স্থির ইহাই সবিশেষ প্রমাণ করিবার জন্যই প্রাসঙ্গিক সুধীর বিলাত-প্রবাসের কর্ম উদ্যম ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন নাই। সুধী যেন স্বীয় প্রজ্ঞার আলোকে বিচার করিয়া য়ুরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সমস্ত বিভ্রান্তকারী মাদকতার মধ্যে তাহার লক্ষ্য এই আদর্শে অবিচলিত রহিয়াছে। আদর্শ হইতেছে ভারতীয় আদর্শ - যাহার বহুমত বহুভাব - সবই একই উদ্দেশ্য সাধক – মানব-কল্যাণ, মানব-প্রীতি - ঈশ্বরই প্রীতি - প্রীতি

সর্বব্যাপিনী। - "বিলাত প্রবাসে তাহার (সুধীর) পূর্ব সংকল্প দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হইয়াছে - তাহার অবলম্বিত পথ যে মানব কল্যাণের একমাত্র উপায়, তাহার য়ুরোপের নানামুখী চিন্তাধারার ও কর্ম প্রচেষ্টার সহিত পরিচয় তাহার এই প্রতীতিকে আরও অসংশয়িত করিয়াছে। এক হিসাবে, সুধীর কোন পরিবর্তন হয় নাই - তাহার অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু তাহার মৌলিক প্রকৃতিটি অক্ষুন্ন আছে। লেখক সুধীকে সত্যের রূপ-হিসাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন। মনে হয় যে, তাহার মানবতার প্রীতি-স্নেহ--ভালবাসার অন্তরালে তাহার এই রূপক প্রতিভাস নৈর্ব্যক্তিক শিখায় জ্বলিতেছে। সত্যের মতই তাহার মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ; সত্যের মতই তাহার অনমনীয় দৃঢ়তা। ইহাতে হয়ত মানুষ-হিসাবে তাহার আকর্ষণ কিছু কমিয়াছে। এক মাত্র উজ্জয়িনীর ব্যবহারের বিচারেই তাহার অমোঘ আদর্শ নিষ্ঠা সাময়িকভাবে বিচলিত হইয়াছে - শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর সমাজ-নিয়ন্ত্রণই জয়লাভ করিয়াছে।"[৪৬] সুধীর দৃষ্টান্ত তো দ্বিধাগ্রস্ত।

ব্যক্তি-স্বাধীনতাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সহ-অবস্থান করিতে পারে না। সমাজ-অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে খর্ব করিবে কারণ ইহার শক্তি বহুব্যাপক - বহু বিস্তৃত। মানুষের মনে ইহার বাসগৃহ। সংস্কাররূপে ইহা বর্তমান থাকে। - ইহার কবল হইতে মুক্তি দুর্লভ - কারণ পরিবারের unit যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি এখনও, সমাজ-নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে স্বীয় সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ব্যর্থ - দেশ-জাতি ও সমাজ প্রস্তুত নয় প্রথা - বিরোধী কোনো ধ্যান-ধারণা জীবনচর্যার অভিনব প্রবর্তনায়। ইতিপূর্বে আমরা অসমাপিকা (১৯৩০ খ্রীঃ), উপন্যাসে নায়ক সুচারু সামাজিক সংস্কার নিয়ন্ত্রণের অধীন, 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ খ্রীঃ) 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসদ্বয়ে সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক ও পারিবারিক দিকটি একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে - প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ত য়ুরোপের মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় এদেশের নরনারী উচ্চশিক্ষিত বা শিক্ষিতা হইলেও তাহারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে বন্দী বা বন্দিনী। এই বন্ধনদশার স্রষ্টা তাহারা স্বয়ং। শৈশবের শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা যে পরিবেশে বাড়িয়া উঠে তাহারা মূল যে অনেক গভীরে। সমাজ-সত্তা অচেতন ভাবেই ক্রিয়াশীল থাকিয়া যায় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'সত্যাসত্য' (১৯৩২ খ্রীঃ - ১৯৪২ খ্রীঃ) এপিকধর্মী সুবৃহৎ উপন্যাসে নায়িকা উজ্জয়িনী বন্দিনী নারী। - ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে য়ুরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার মত হয়

নাই — য়ুরোপের নারী-প্রগতির কোনো মৃদু কম্পন বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয় নাই — ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। আর ভারতীয় সমাজে স্ত্রী একান্তভাবে স্বামী-মুখাপেক্ষী। স্বামীই স্ত্রীর জীবনে পরম সম্পদ ও গৌরবের বিষয় ইহকাল ও পরকালের সঙ্গী এই ধারণা সনাতন হিন্দুনারীর ধারণা। হয়ত একান্ত নির্ভরতার জন্যই স্বামীর অবহেলায় বা অবিচারে স্ত্রীর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উজ্জয়িনীর জীবনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে — প্রোষিতভর্তৃকা নিঃসঙ্গ উজ্জয়িনীর জীবনে স্বামী বাদলের স্মৃতি ও স্মৃতিরোমন্থনই একমাত্র আশ্রয় ছিল। কদম খুঁয়ায় শ্বশুরবাড়ীর পাশে একটি বাড়ীতে এক অধ্যাপকের তরুণী স্ত্রী বীণার জীবনের সহজ সুখের নানা ছোটখাটো চিত্র দেখিয়া উজ্জয়িনী তৃষিত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে — ইহার মধ্যেই তাহার 'ই মোশন'-এর প্রকাশ। তাহার জীবনের বড় প্রশ্ন : 'বেঁচে কি হবে ?' কার জন্য বাঁচব ?' 'কার কাছে আমার আদর ?' — উপন্যাসের উত্তর পর্ব জুড়িয়া নায়িকা উজ্জয়িনী এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। উজ্জয়িনী বন্দিনী নয়তো কি ? উজ্জয়িনী 'ফ্রিওম্যান' নয় 'সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা'। উজ্জয়িনী নারী। তাই তাহার চরিত্রে হৃদয়াবেগ মূলত থাকিবেই। নারী সৃষ্টিতে বিধাতাপুরুষ তাহাকে এই মানসিকগুণের অধিকারিণী করিয়াছেন — ইহারই জোরে সে সংসার করে ঘর বাঁধিয়া শত দুঃখেও অন্তরের ভালোবাসার প্রদীপখানি জ্বালাইয়া রাখে। উজ্জয়িনী বিবাহের নিগড় ভাঙিয়া কোনো গ্রহণযোগ্য সমাজ-সমর্থিত সমাধানে উপনীত হইতে অক্ষম। যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার অচেতন মনে ক্রিয়াশীল। ইহা হইতে পরিত্রাণ নাই। অন্নদাশঙ্কর অবশ্য যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে এই সমাজ ব্যবস্থার শিকার হিসাবে উজ্জয়িনীকে চিত্রিত করিয়াছেন। যথেষ্ট শিক্ষা লাভ সত্ত্বেও উজ্জয়িনী সামাজিক বিধানকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না — অর্থাৎ উজ্জয়িনীর মধ্যে স্ব হৃদয়সত্তা ও সমাজ-সত্তা এই দুইয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল - জয়ী হইল তাহার সমাজ-সত্তা। ভারতীয় নারী মাত্রেই বন্দিনী তাহারা কেহই 'ফ্রি ওম্যান' নয় অন্তত তিরিশের দশক হইতে শুরু করিয়া ষাটের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বলা চলে। উজ্জয়িনীর বড় প্রশ্ন : 'বেঁচে কি হবে ?' 'কার জন্য বাঁচব?' 'কার কাছে আমার আদর ?' উজ্জয়িনীর মত দশাপ্রাপ্তা নারীর প্রশ্নই হয়ত অন্নদাশঙ্করের কাছে — "বিবাহের নামে যে প্রকাণ্ড প্রহসন সমাজে চলিতেছে, যে পুতুল খেলার অভিনয় অনুষ্ঠিত হইতেছে।"[৪৭] তাহা 'প্রথা-দাসত্বের কবন্ধ নৃত্য'। শরৎচন্দ্রও 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'দেবদাস' উপন্যাসে ওই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সযত্নে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তৎপরবর্তী রবীন্দ্রনাথও 'সামাজিক আধি'র প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

'সত্যাসত্য' (১৯৩২ খ্রীঃ - ১৯৪২ খ্রীঃ) শীর্ষক বিশালায়তন - গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ।[৪৮] ইউরোপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পীঠভূমি — এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে অন্নদাশঙ্করের ঐকান্তিক আস্থা — এই কারণেই লেখক অন্নদাশঙ্করের বিশেষ আকর্ষণ য়ুরোপের প্রতি। অন্নদাশঙ্কর খণ্ড চেতনা, খণ্ড বিশ্বাস, ও খণ্ড সত্যের সন্ধানে প্রমত্ত ন'ন। তিনি জীবনের সামগ্রিক সত্যের অন্বেষক। তাঁহার সত্তার গভীরতম প্রার্থনা : 'সাহিত্যে মানব জীবনের সমগ্ররূপ ধরা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক।'[৪৯] জীবনের সমগ্র রূপের যথার্থ অন্বেষক অন্নদাশঙ্কর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হইয়াও উৎকেন্দ্রিক হইয়া পড়েন নাই শেষ পর্যন্ত। জীবনের বিচিত্র বিরোধী চেতনার রূপায়নের মধ্য দিয়া জীবনে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি স্বতন্ত্র — এ যেমন সত্য, আমি অভেদ - এও তেমনি। বিশ্বের কেন্দ্র যেখানে সেইখানে আমারও কেন্দ্র।[৫০] এই চেতনায় তিনি জীবনের বিরোধের জটিলতার সমস্যাগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মুক্তি সন্ধানী যুবকের মনে যে রেখাপাত ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেই অশান্ত অস্থির মানসলোকের চিত্র অঙ্কন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন আবার জীবনের চরম অস্থিরতার মধ্যে শান্ত স্থির সমেত প্রজ্ঞাদৃষ্টির অপ্রমত্ত চিত্র অঙ্কনেরও প্রয়াস পাইয়াছেন? আমার মনে হয় এই প্রমত্ত প্রজ্ঞাদৃষ্টির চেতনা লেখক লাভ করিয়াছেন মূলত ভারতবর্ষের আত্মিক সত্তার কাছ হইতে। আর এই অর্থে কেবল ইউরোপ নয়, ভারতবর্ষও তাঁহার বিশ্বাসের জগতে ও সৃজনলোকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লাভ করিয়াছে। আর এই ব্যাপক বিশ্ব সমীক্ষায় অনুপ্রাণিত, সমগ্র জীবন সত্যের ধ্যানে স্থির সঙ্কল্প অন্নদাশঙ্করের সৃজনলোক থেকে একদিন আত্মপ্রকাশ করিল — 'সত্যাসত্য' — তাঁহার বিখ্যাত 'এপিক' ধর্মী উপন্যাস।

'সত্যাসত্য' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' - এর প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত একটি ভূমিকায় লেখক অন্নদাশঙ্কর নিজের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন — "সত্যাসত্য এপিক তথা রূপক হবে।"[৫১] এই গ্রন্থটি রচনার মূলে যে তাঁহার মনে যে রূপক চেতনাটি সক্রিয় ছিল তাহা লেখকের ভাষায় এইরূপ — "বিশ্ব ব্যাপারের যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বত্র সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাকে দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan ; তাদের নিয়ে 'প্যারাডাইস, লস্ট' রচিত হইয়াছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্য অসত্য। গোড়াতে আমার সঙ্কল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও 'এপিক' রচনা করব, কিন্তু পদ্যে নয়

পদ্যে ---। গ্রন্থের মুখ্যনায়কের নাম রাখতাম সত্য এবং অসত্য। কিন্তু এখন নাম কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব সুধী এবং বাদল। ---- নায়িকাহীন কাব্য হয় না। অতএব উজ্জয়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় দোলাবে। সে যেন সত্যটার মানবাত্মা।"[৫২] অন্নদাশঙ্কর শেষ পর্যন্ত কাহিনীর রূপকত্ব পরিহার করিয়াছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে জীবনের সত্য কখনোই বুদ্ধিপ্রসূত বাঁধা ছকের রূপক পরিকল্পনাকে অবিকল অনুসরণ করিয়া চলে না। বাস্তব ক্ষেত্রে লেখক বুঝিতে পারিলেন উপন্যাস রচনা পর্বে যে 'বাদল-সুধী-উজ্জয়িনী' অন্নদাশঙ্করের অর্থাৎ স্রষ্টার হুকুম মানে না। ধীরে ধীরে কাহিনীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্র ও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই বৃহৎ উপন্যাসে য়ুরোপীয় পটভূমি ও ভারতীয় জীবন চর্যার দোটানায় সৃষ্টির অমোঘ প্রভাবে বহু নরনারী আসিয়া ভীড় করিয়াছে যুগপৎ দেশ-কাল-পাত্র সমন্বিত পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে — ইহাদের প্রত্যেকের রূপকের অঙ্গীভূত করা যুক্তিযুক্ত নয় মনে হয়। — তাহারা শক্তি নয় — রক্ত মাংসের মানুষ। অতএব 'রূপকত্ব' অন্তর্হিত হইয়াছে। — অন্নদাশঙ্কর রূপক সজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন। "এই গ্রন্থের 'এপিক' - আখ্যা 'যার যেথা দেশ'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বিদ্যমান ছিল। পরে অবশ্য তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 'এপিক' - আখ্যা প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছিলেন। এই প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট কারণ লেখক দর্শান নাই। এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড 'অপসারণ' (১৯৪২) - এর 'উত্তর ভাষণ' অংশেও এই 'এপিক'-এর দাবী প্রত্যাহারের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।"[৫৩] সেখানে কোনো স্পষ্ট কারণ নির্দেশ করেন নাই লেখক। মনে হয় লেখকের ধারণা হইয়াছিল যে বর্তমান যুগের সমাজ ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সার্থক 'এপিক' রচনা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগ-পরিবেশে 'এপিক' রচনা কেন সম্ভব নয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত সমালোচকের বক্তব্য হইতে স্পষ্ট হইবে। — The epic was a complete expression of a society in a way in which the novel never has been and never could be. There was a balance between the characters of the epic and the society in which they lived which has since been lost. Indeed, the 'Illiad ' is more a picture of a society than of any one of its characters, a society in which the individual does not feel himself in opposition to the collective, any more than he feels himself in conflict with nature. He is a part of his society .....

The novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against society against nature, and it could only develop in a society where the balance between man and society was lost." [৫৪] এই উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট হয় যে যুদ্ধোত্তর বর্তমান যুগে রীতিসম্মত 'ক্লাসিক্যাল এপিক' রচনা সম্ভব নয় কারণ 'চরিত্র' ও 'সমাজের' মধ্যে সাম্য বা 'Balance' সুনির্দিষ্ট নয়। তবে বৃহৎ জীবনধর্মী উপন্যাসের মধ্যেও 'এপিক'-এর লক্ষণসমূহ বর্তমান থাকিতে পারে। 'সত্যাসত্য' খাঁটি 'এপিক' উপন্যাস না হইলেও 'এপিক'-এর কিছু লক্ষণ বর্তমান আছে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ উপন্যাস 'গোরা' ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'গোরা' উপন্যাসের পরে এত বৃহৎ পটে জীবনের বহুমুখী জটিল সমস্যার এমন ব্যাপক কাহিনী আর ইতিমধ্যে রচিত হয় নাই। পটভূমির দিক হইতেও 'গোরা' (১৯১০ খ্রীঃ) উপন্যাসকে বহুলাংশে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

সত্যাসত্য' উপন্যাসের পটভূমি বহু বিস্তৃত — কেবল বাংলাদেশ নয়, (অবিভক্ত বাংলা) ভারত ভূখণ্ডের (অবিভক্ত ভারত) নানা স্থানের পরিবেশের সংযুক্ত হইয়াছে প্রথম-যুদ্ধোত্তর জীবন-যাত্রা বা জীবনচর্যা। উপন্যাসের পরিমণ্ডলের ব্যাপক বিস্তার প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের বহুবিধ সমস্যা ও ইহার তাৎপর্য এবং ইহার নিহিত মূল্যবোধের মাপকাঠিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক হইতে এই উপন্যাস অনন্য বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থের মূলসুর হইতেছে যুদ্ধোত্তর কালের বিচিত্র সমস্যার প্রতিফলন ও ইহার নিগূঢ় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নায়ক বাদলের মনোজগতে কী অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই মূল বক্তব্য। বলা যায় বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমীক্ষার ইতিহাস বা দলিল হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য।

বাদলের ('সত্যাসত্য' উপন্যাসের নায়ক) চরিত্র ও তাহার জীবনগত অভিজ্ঞতা আধুনিক কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রত্যাশিত রূপ মাত্র। এই আধুনিক কালের বুদ্ধিজীবী মানুষ এবং সাহিত্যে তাহার বর্ণিত রূপের রকম-ফের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য লক্ষ করিবার মত। রবীন্দ্রনাথ

যথার্থই বলিয়াছেন : "বর্তমান যুগে পূর্ব যুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না । এখনকার মানুষ জীবনের যে সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তা-প্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এইজন্য তার মননবস্তু জমে উঠেছে বিচিত্ররূপে । এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে - - - - । তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলেছে । ... অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা দেয়, তখন তাবে বলায় চলায় সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে । তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্‌গত হ'লে উঠবেই । অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই ।"[৫৫]

বাদল চরিত্র যুদ্ধোত্তর (প্রথম যুদ্ধোত্তর) যুগের এক সমস্যা-জর্জর যুগের জীবন্ত আলেখ্য । 'গোরা' (১৯১০ খ্রীঃ) উপন্যাসের গোরার মতই 'সত্যাসত্যের' বাদল চরিত্র নানা বিতর্ক, আলোচনা, মননধর্মী চিন্তা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে । এই বিতর্ক, আলোচনা চিন্তা যেমন গোরা, বিনয়ের চরিত্রে আরোপিত নয় তেমনি বাদল চরিত্রেও নয় - বরং ইহাদের সামগ্রিক সত্তারই প্রক্ষেপ মাত্র । বাদলকে লেখক অসত্যের প্রতীক করিয়া চিত্রিত করিবেন এই ইচ্ছা তাহার ছিল পরে বাদল ব্যক্তি মানুষের বন্ধন-মুক্তির পিপাসার প্রতীক হইয়া উঠিল । 'বন্ধন - মুক্তি' মানুষের সর্ববিধ বন্ধন-মুক্তির তত্ত্বটি অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী উপন্যাসে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে -- যেমন 'কন্যা' (১৯৫২ খ্রীঃ) 'না' (১৯৫১ খ্রীঃ), বিশল্যকরণী, (১৯৬৭ খ্রীঃ) 'তৃষ্ণার জল' (১৯৬৭-৬৮) 'রত্ন ও শ্রীমতী' (তিন খণ্ড) - প্রথম ভাগ - ১৯৫৫-৫৬, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৫৫-৫৭ ; তৃতীয় ভাগ - ১৯৭১ খ্রীঃ ।

উপন্যাসটির 'সত্যাসত্য' নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ । বাদল অসত্যের প্রতীক, সুধী সত্যের প্রতীক । 'অসত্য' তাই যাহা অস্থায়ী, অস্থির, পরিবর্তনশীল, যাহা প্রবাহমানতার স্রোতে ভাসমান, যাহা মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতি পদে পদে নিজেকেই নিজে অস্বীকার করে আর সত্য হইতেছে তাহাই যাহা শাশ্বত, স্থির যাহা সমস্ত পরিবর্তনশীলতা ও প্রবহমানতার মধ্যে অচঞ্চল হইয়া স্থির থাকে । অসত্য হইতেছে ইন্টেলেক্ট বা বুদ্ধির পথ ; সত্য 'ইনটিউশন' বা বোধের পথ । বুদ্ধির ক্রিয়া সবকিছুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা তাই বুদ্ধির সমস্ত সিদ্ধান্ত আংশিক দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল তাই দেখিবার এই

ভারতত্বের জন্য তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল। 'ইনটিউশন' বোধ এক সঙ্গে সমগ্রকে দেখিতে পায় বলিয়া ইহার সিদ্ধান্ত স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। আধুনিক য়ুরোপ বুদ্ধির মার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, আর তাই তাহার এত দশান্তর। ভারতবোধের মার্গ ধরিয়া চলে। বাদলের বাঁচিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিবার মধ্যে আছে বুদ্ধিমার্গে বিচরণের পরিণতি জীবনের সব কিছুকে বুদ্ধির আলোকে যাচাই করা সম্ভব নয়। বাদলের আত্মঘাতের কারণ আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় গ্রহণযোগ্য কোনো সদুত্তর বা সমাধান কোনো তত্ত্ব বা 'ইজম'-এর মধ্যে নিহিত নয়। বাদল বুঝিতে পারে মানব-মুক্তির কোন ধ্রুব বাণী উচ্চারণ করিতে সে অক্ষম। আমার মনে হয় বাদলের ট্র্যাজেডি আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার ট্র্যাজেডি, মানবিক প্রচেষ্টার ট্র্যাজেডি। সুধী ভারতীয় আদর্শে মানবিক বৃত্তিতে সমৃদ্ধ চরিত্র। য়ুরোপীয় আদর্শে, ভাবনায় জীবনের ধ্রুব সত্য লাভ করা সম্ভব নয় বলিয়া ভারতীয় আদর্শের মধ্যে সেই সত্যের অনির্বাণ আলোকের সন্ধানী হইয়াছেন অন্নদাশঙ্কর এই গ্রন্থটিতে তবে স্বয়ং লেখকও এই ভারতীয় আদর্শের সঠিক রূপটি সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। উজ্জয়িনী মূলত নারী। তিরিশ-চল্লিশের দশকের ভারতীয় নারী বুদ্ধিমার্গে বিচরণ করিত না। ভারতীয় নারীর সংস্কার তাহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান - প্রেম ও স্বামী নির্ভরতাই তাহার জীবনের সবটুকু অস্তিত্ব একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিলাত-প্রবাসী স্বামী বাদলের প্রতি তাহার আন্তরিক প্রেম। বাদলকে যখন উজ্জয়িনী পাইল না তখন ধর্মের পথে আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা Sublimation ঊর্ধায়ন করিতে তৎপর হইয়াছে। বাদলের মৃত্যুর পরে উজ্জয়িনীর মর্মভেদী কান্নার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। বাদলের প্রতি উজ্জয়িনীর ভালবাসা গভীর ও আন্তরিক ছিল। বাদলের মৃত্যু উজ্জয়িনীর কাছে 'বন্ধন-মুক্তি'র দুয়ার খুলিয়া ছিল। হিন্দু সংস্কারের বোঝা হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবন সুরু করিবার জন্য উন্মুখ হইল -- সুধীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ উজ্জয়িনী সুসংস্কৃত দে সরকারের সঙ্গে নূতন পথে যাত্রা করিল — এই ভাবেই হয়ত বন্ধন-মুক্তির একটি সম্ভাব্য পথ - অন্নদাশঙ্কর বাছিয়া লইয়াছেন -- বিধবা নারীর পুনরায় সধবার মত জীবনযাত্রা সমাজ গ্রহণ ও অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে নির্দ্বিধায়। ইহাতে যেন অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। বিধবার পুনরায় স্বামী গ্রহণ দ্বিতীয়বারের জন্য, ঘর বাঁধিবার জন্য আইনানুগ হইলেও অদ্যাবধি খানিকটা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। ত্রিশের দশকেও বিধবার বিবাহের প্রভাবে সামাজিক-মানস-সন্ত্রস্ত-দ্বিধাগ্রস্ত। 'সত্যাসত্য' বার বছর ধরিয়া রচিত হয় সুরু হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ খণ্ড লিখিত হয় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। নিঃসন্তান নারী স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিতে পারে - বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর বেলায় অন্নদাশঙ্কর

সেই প্রথানুবর্তন করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত হিন্দু নারীর সংস্কার ক্ষুন্ন হইয়াছে — কিন্তু মানুষের মর্য্যাদা জীবনের পূর্ণতা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। উজ্জয়িনী বিবাহ না করিয়া সন্দেহভাজন চরিত্র সুসংস্কৃত দে সরকারের সঙ্গে নূতন জীবন রচনা করিতে আগাইয়া গেল — অন্নদাশঙ্কর মোহমুক্ত সুস্থ সমাজ নিরপেক্ষ নরনারীর চিরন্তন সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উজ্জয়িনীর এই দশান্তর বা মার্গান্তর সমর্থন করিয়াছে — মৃত বাদলের স্মৃতি ও বৈধব্য জ্বালা দেহের জ্বালা বহন করা অপেক্ষা দে সরকারের সঙ্গে চলিয়া যাওয়া মন্দের ভালো। ওই কালসীমায় এই শ্রেণীর নারীর ইহা অপেক্ষা সুন্দর শোভনযোগ্য মানবিক সমাধান সম্ভব ছিল না। অন্তত তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এদেশে। অন্নদাশঙ্করের বয়স যখন ৩২ (বত্রিশ বছর) তখন সংকল্প করেছিলেন রত্ন ও শ্রীমতী লিখবেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এই প্রতিশ্রুতি বা সংকল্প উপন্যাসের বাঙ্ময় বা সারস্বত রূপ লাভ করে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন রত্ন ও শ্রীমতী প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। এই 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাস রচনার পূর্বে অন্নদাশঙ্করকে — "অনিবার্য কারণে 'না' (১৯৫১ খ্রীঃ) লিখতে হলো, 'কন্যা' (১৯৫২) লিখতে হলো। এ দুটি পদক্ষেপ না নিলে চলত না। তারপর নিজের থিওরিটা একবার ঝালিয়ে নিলুম 'সাহিত্যে সঙ্কট' উপলক্ষে। এই থিওরি টলস্টয়-এর ('হোয়াট ইজ আর্ট') সঙ্গে কতক মেলে কতক মেলে না। লিখতে লিখতে ভাবতে ভাবতে আমি আমার নিজের পথ পেয়ে গেছি। এখনও এর সবটা আমার জানা নেই। মোটের উপর একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। তা হলেও আমি প্রস্তুত। যাত্রার জন্য প্রস্তুত।"[৫৬]

"আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিল জনগণের জন্য লেখার বাধ্যবাধকতা। জোর করে এ দায় আমি কাটালাম। আমি লিখব জনগণের জন্য নয়। বিদগ্ধ মণ্ডলীর জন্য নয়, Ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের জন্যে। যে পাঠক আমার চোখের সামনে নেই, কোথায় আছে আমি জানিনে। হয়ত আমারই অন্তরে। সে আমাকে অনেক বেশী স্বাধীনতা দিয়েছে। এখন আমি অনেক বেশী স্বাধীন। জনগণের বোঝা পিঠে নিয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠতে যাওয়া মূঢ়তা এভারেস্ট যদি জয় করতেই হয় তবে বোঝা সব চেয়ে হালকা হলেই ভালো। 'রত্ন ও শ্রীমতী' (প্রথম ভাগ ১৯৫৫-৫৬) শেষ পর্যন্ত কেমন উতরাবে জানিনে। হয়ত আদৌ উতরাবে না। হয়ত দু হাজার ফুট উঠেই আমার দম ফুরিয়ে যাবে, পথের প্রারম্ভেই বসে পড়ব। হয়ত দু'হাজার ফুট পর্যন্ত আমার মুরোদ, তার বেশী আমার ক্ষমতাই নেই। পঞ্চাশ পেরিয়েছি, একান্ন পেরিয়েছি।

এটা তো উঠতি বয়স নয়, উঠব কী করে । কি বোঝা আমি এক এক করে নামিয়ে দেবই । জনগণের বোঝাটি সর্ব প্রথম নামালুম ।"[৫৭]

"তারপর রত্ন ও শ্রীমতী দুরূহ বই । হাজার সরল ভাষায় লিখলেও উচ্চতর গণিত বোধগম্য হয় না সকলের । এ বই বুঝবে তারাই যারা জীবনে কিছু পেয়েছে । তা সে সুখ-দুঃখ যাই হোক । তা বলে আমি ইচ্ছা করে দুর্বোধ্য ভাষায় লিখব না । বরং যতদূর পারি সরল সহজ, সরস করে লিখব । ভাষা যেন বোঝবার পথে বাধা হয়ে না ওঠে । পল্লবিত অলঙ্কৃত বাক্য একটা বাধা । বাক্-বিভূতির মোহ আমার নেই । ঐশ্বর্যকে আমি একটা প্রলোভন বলে মনে করি । শব্দের ঐশ্বর্যের কথা বলছি । কিন্তু সৌন্দর্যের কথা আলাদা । সৌন্দর্য যদি প্রতি ছত্রে না ফুটল তবে লিখে আমার আশ মিটল না ।"[৫৮]

সৌন্দর্য বলতে এতদিন আমি জানতুম সুন্দর রূপ । অর্থাৎ বহিঃ সৌন্দর্য । সম্প্রতি দু'বছর হ'ল আমার জ্ঞান হয়েছে যে তাই সব নয়, যদিও অনেকখানি । অন্তঃ সৌন্দর্য বা সুন্দর সত্তা না হলে 'আর্ট' শ্রীহীন হয় । সুন্দর রূপ সত্ত্বেও । ফর্মাল বিউটি তো থাকবেই । তার চেয়ে বড় কথা 'এ-সেনশিয়াল বিউটি' । কোথায় পাই কার কাছে, এর জন্যে ? পেছিয়ে গেল এর জন্যে কিছুদিন । বছরখানেক ।"[৫৯]

"সত্যের উপর জোর বরাবর দিয়েছি, আরও জোর দিতে হবে এবার । কিন্তু আমি স্টোরি লিখতে বসেছি । হিস্ট্রি লিখতে বসিনি । জীবনী বা ইতিহাস লিখলেই তা উপন্যাস হয় না । জীবনের সত্যকে 'আর্ট' -এর সত্য করতে হবে । অনেক বাদ যাবে, অনেক জোড়া হবে, অনেক বদলাবে । রূপান্তরিত না হ'লে জীবন কখনো আর্ট হবে না । তারপর তথ্যের সবটাইতো সত্য নয় । যা ঘটে তা দেখলে কেউ সত্যের স্বরূপ দেখতে পায় না । আরও গভীরে যেতে হয় । তারজন্য চাই আর এক রকম দৃষ্টি । অন্তর্দৃষ্টি । রিয়ালিটির উপর খুটো শক্ত হবে কি করে, যদি অন্তর্দৃষ্টি মর্মভেদী না হয় ? সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হবে আর একটি খুটি । সেটি 'ডিলাইট প্রিন্সিপলের' উপর । রসের উপর । আনন্দ দেওয়াই সাহিত্যের কাজ । আর যদি অন্য কোনো কাজ থাকে সেটা অধিকন্তু । কিন্তু যে উপন্যাস রস দিতে না পারে সে তার আসল কাজই জানে না । .... মানুষ বাঁচে রস পেয়ে ; এটা তার তৃষ্ণার জল । ...... 'আর্ট' চিরকালের । কিসের তৃষ্ণা ? রসের ।

অরূপের যে রূপ রসের মধ্যে অভিন্ন। সাহিত্যের আনন্দ একাধারে রসের ও রূপের। ...... চরিত্র চিরে চিরে দেখানো আমার দ্বারা হবে না। চরিত্র আতই থাকবে। বিচিত্র হবে। কোনো কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্যে আসরে নামবে না। নামবে কাহিনীর প্রয়োজনে।"[60] অন্নদাশঙ্করের স্বীকারোক্তি — "রত্ন ও শ্রীমতী" দুরূহ বই। হাজার সরল ভাষায় লিখলেও উচ্চতর গণিত বোধগম্য হয় না সকলের। এ বই বুঝবে তারাই যারা জীবনে কিছু পেয়েছে। তা সে সুখ দুঃখ যাই হোক।"[61] লেখকের এই বক্তব্য 'রত্ন ও শ্রীমতী' বুঝিতে হইলে সম্যকরূপে মানব-প্রকৃতি ও মানব-নিয়তি সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইতে হইবে। নতুবা এই উপন্যাসের রসাস্বাদন দুরূহ। এইখানেই অনধিকারীর কাছে গ্রন্থখানির 'Premises ' ' এর দুরূহতা। হয়ত এই কারণেই "রত্ন ও শ্রীমতী" উপন্যাসখানি উচ্চতর গণিতের সঙ্গে তুলনামূলক রূপে লেখক গণ্য করিয়া পাঠককে সতর্ক করিয়াছেন — এই প্রসঙ্গে 'ইবসেন'-এর 'ডলস্ হাউস' -এর নোরা-র কথা স্মরণ করা যাইতে পারে — মর্মভেদী সত্যানুসন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে মানব-প্রকৃতিও মানব-নিয়তির লীলা বা ক্রিয়া-কলাপ বোধগম্য হয়, নতুবা নয়। মানব জীবন ছক-বাঁধা প্রথা অনুসরণ করে না ইহার ব্যতিক্রমও অসম্ভাবিত নয়। মানব-প্রকৃতি ও মানব-নিয়তি দুর্জ্ঞেয় ইহার অনেক সত্য এখনও বুদ্ধির অগোচর সেই দিক দিয়া 'রত্ন ও শ্রীমতী'র যথেষ্ট মূল্য আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

'কন্যা' (১৯৫২ খ্রীঃ) ও 'রত্ন ও শ্রীমতী' (১৯৫৫-৫৬) প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেছে : " — There is a basic difference between the ruling idea of 'Kanya ' and that of "Ratna O Srimati". The latter is a love story concerning a Free Man and a Free Woman. The former is a quest for Eternal Feminine. Imagine her as four woman or aspects - she who has great physical beauty and charm but can not be possessed for long ; she who has spiritual and intellectual beauty shining through her face but is beyond our hero's reach ; she who is capable of rare feats of heroism or is beautiful in action but becomes common place if possessed and she who is everywhere and nowhere - the woman among woman - the

womanly spirit or feminine principle - who is not to be possessed but felt .... "[৬২] এখন এই বক্তব্যের আলোকে ইহা স্পষ্ট যে 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসখানি আগাগোড়া খ্রিষ্টান ও খ্রিষ্টানের প্রেমতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত — ইহার নিয়ামক মানব-প্রকৃতি ও মানব-নিয়তি। মানব জীবনের চরম সত্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন করাই ইহার মূল সুর। ওই একই মূলসুর ''কন্যা' গ্রন্থখানিতেও বর্তমান একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত আর একখানি পত্রে 'কন্যা'র সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন : " — 'কন্যা' আমার ত্রিশ বছর ব্যাপী সাধনার ফল। সাধনার প্রথম ধাপে পা দেবার আগেই ওর শেষ ধাপের মর্ম কী বুঝবে ? তবে আমি কাউকে পরামর্শ দেব না এই চারটি পথের পথিক হতে। বরং সতর্ক করব। ধরে নাও ও বইটা একটা Warning বা 'হুঁশিয়ারী'। ওর লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা প্রকাশ্যে বলা যায় না। যারা ওপথ দিয়ে যাবে তারা নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয় দেখতে পাবে প্রত্যেকটি Stage ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি Stage -এর Clue খুঁজলে পাবে। ও বই শুধু চোখ বুলিয়ে যাবার জন্যে নয়। তবে যারা সাহিত্য হিসাবে পড়তে চায় তাদের জন্যে গল্প বলা হয়েছে গল্পের নিয়মে। আপাতত ওটাকে গল্পের বই বলেই বিচার করবে।"[৬৩]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২) রচনার পর অন্নদাশঙ্কর আরও দার্শনিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। পঞ্চাশোত্তর যুগে লিখিত 'কন্যা'(১৯৫২) নামক উপন্যাসখানি অন্নদাশঙ্করের দার্শনিক ভাবনার অন্যতম ফল। চার তরুণ বন্ধু চিরন্তনী নারীর সন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। প্রকৃতিরূপী নারীর শক্তি শিবরূপী পুরুষকে সৃষ্টির মায়াশৃঙ্খলে বিস্ময়ময় আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে — তাহারই দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণে পুরুষ-প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্ক সৃষ্টির আদিম অব্যাহত ধারায় ধাবমান হইতেছে। কাহিনীর বিষয় হইতেছে তিন বন্ধু বহু আয়াস ও সাময়িক সার্থকতার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া চতুর্থ বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখিতে। যাহা অনন্ত তাহাকে পাইবার সাধনাই মানুষের চিরন্তন সাধনা (Eternal Quest); ব্যক্তি মানুষ ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত থাকে। এই বক্তব্যই 'কন্যা'র আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। চার বন্ধুর চারটি উপকাহিনী অনাবশ্যক জটিলতায় ভারাক্রান্ত। অন্নদাশঙ্করের উক্তিকথন ও ঘটনার বিস্তৃতি উপন্যাসখানির ত্রুটি বলিয়া মনে হয়। তবে

তত্ত্বের বিচারে ইহার হয়ত প্রয়োজন আছে। মানব-প্রকৃতির আর একটি দিক দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন 'কন্যা' উপন্যাসে। তাই ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্নদাশঙ্কর জনগণের ভালো-মন্দ লাগিবার বোঝা নামাইয়া অনির্দেশ পথে যাত্রা করিয়া যে রত্ন সাহিত্যের আসরে জমা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা মহাকালের দরবারে স্থায়িত্ব লাভ করিবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহাকাল জীবনের নিখুঁত ও নিরেট খাদহীন সত্য ছাড়া জীবনের কোনো কথার স্বীকৃতি দেয় না। অন্নদাশঙ্কর যুগকালকে অতিক্রম করিয়া চিরকালের মানুষের জীবনসত্যকে সামগ্রিকভাবে মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে করায়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'কন্যা' ও 'রত্ন ও শ্রীমতী' সম্ভবত মানব-প্রকৃতি ও মানব-নিয়তির কালজয়ী সারভূত রূপ। এখানে যেন ব্যক্তি সমাজ অপেক্ষা সম্মানজনক আধিপত্য লাভ করিয়াছে — লেখক স্বয়ং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় + ইহার মূলে আছে মানব-প্রেম মানুষের প্রতি দরদ যাহার প্রেরণা যতটা না য়ুরোপীয় তদপেক্ষা বেশী ভারতীয়। হিংসা ও অপ্রেম ভারতীয় আদর্শ নয়। ভারতীয় ঐতিহ্য অহিংসা ও প্রেম বা মৈত্রী। যদিও ধর্মাশোকের রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই বুদ্ধের বাণী ও আদর্শ ভারত হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার রেশটুকু অদ্যাবধি সক্রিয়। বুদ্ধের পরে যত ধর্মবেত্তা ভারতে জন্মিয়াছেন প্রত্যেকেই প্রেমের মৈত্রীর বাণীই প্রচার করিয়াছেন উপনিষদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তির। বিংশ শতকে মহাত্মা গান্ধীও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রেম ও মৈত্রীর বাণীই শুনাইয়াছেন। তাই প্রেমের দৃষ্টিতে মৈত্রীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিকে সামগ্রিকরূপে বিচার করিলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেই হইবে। মনে হয় অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ য়ুরোপ ও ভারতীয় ভাবনার মিশ্রিত ফল। উভয় ভাবনার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। অন্নদাশঙ্করের মানব-প্রেম ও নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে একটি নিজস্ব ধারণা আছে। একটি বিশেষ প্রত্যয় আছে। তিনি বলিয়াছেন: "প্রেম বলতে আমিও মানব প্রেম বুঝি, যেমন বুঝতেন টলস্টয় ও গান্ধী। কিন্তু আমি প্রেম বলতে আরও বুঝি পুরুষের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। টলস্টয়ের সারা জীবন গেল এর মর্ম বুঝতে। গান্ধী বৃথা চেষ্টা করলেন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে। টলস্টয়ের অপূর্ব জ্ঞান সত্ত্বেও, গান্ধীর নিখুঁত সিদ্ধান্তাদি সত্ত্বেও নারীকে তাঁরা কেউ চিনতেই পারলেন না। অচেতন ভাবে নারীকে তাঁরা দেন অধীনতার ভূমিকা, যেমন দিয়ে এসেছেন ধার্মিক পুরুষেরা এতকাল শাস্ত্রের নামে। গৌরবে দিশা-হারা হয়ে। আসলে কিন্তু নারীকে তারা নরকের মত ডরাতেন। তাঁদের সহজাত সংস্কার

তাঁদের বলত, নারী ও পাপ এক অপরের সঙ্গে যুক্ত। আমি এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় মানবপ্রেম ও নরনারীর প্রেম সমান গুরুত্ব পাবে।"[৬৪] এই বক্তব্যের শেষ কথা হইতেছে নারী হইবে স্বাধীনা – পুরুষের সমকক্ষ, আপন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে দাম্পত্য প্রেমেও তাহার স্বকীয় ভূমিকা থাকিবে যাহা সমাজ বা প্রথাসিদ্ধ অতীত সংস্কার নিরপেক্ষ। আর ঠিক এই সূত্রেই আর একটি অন্নদাশঙ্করের আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করা প্রয়োজন যাহার মূল মানবপ্রেম তো বটেই নারীর প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক। নূতন সমাজ ব্যবস্থায় যাহা এখন আসি আসি করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে সমাজ মানসে স্বীয় স্থান করিয়া লইতেছে তাহা হইতেছে আধুনিক যুগে নারীর প্রেম ও বিবাহ। নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে অন্নদাশঙ্করের মনোভাব স্পষ্ট হইবে। যে ভাববীজ 'রত্ন ও শ্রীমতী' (তিন খণ্ডে), 'বিশল্যকরণী', 'তৃষ্ণার জল', 'না', ও 'কন্যা' উপন্যাসের ভাবপুষ্টি রচনা করিয়াছে। অন্নদাশঙ্কর বলিয়াছেন : – 'স্পষ্ট বুঝতেই পারছ আমাদের বিবাহ প্রথা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপ্রেমিকের সঙ্গে অপ্রেমিকার বিবাহ রদ করা চাই।"[৬৫] – আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন – "ভবিষ্যতে আমাদের বিবাহ-প্রথা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার মতো হলে প্রেমিকা হবে স্বকীয়া, প্রেমিক হবে স্বকীয়; পরকীয় বা পরকীয়ার উপর অযথা উচ্চতা আরোপ করা হবে না।"[৬৬]

বিবাহের একটি সামাজিক তথা পারিবারিক দিক আছে। তাহা জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি হইতেছে পরিবারের **unit** আর নারী-পুরুষ উভয়েই তার অংশীদার বা শরিক। পরিবারের একত্রিত রূপ সমাজ বৃহত্তর অর্থে জাতি বা দেশ। বিবাহের সার্থক সর্ববাদী সম্মত উদ্দেশ্য হইতেছে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখা। মানব সন্ততির প্রবাহ জাতির শক্তির উৎস দেশের শক্তির আকর। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার প্রণয়মূলক বিবাহ সব ক্ষেত্রেই যে জীবনের সর্বাবস্থায় ঘাতসহ হইবে এই **Gurantee** কোথায় ? বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রণয়মূলক বিবাহ আদালতের রায়ে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হইতেছে – সেখানে **Problem of broken families '** এতই ব্যাপক যে সরকার ইহার নীতিগত সামাজিক দিকটির গুরুত্ব সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমেরিকায় বড় শহর 'নিউইয়র্ক' 'ওয়াশিংটন'-এ প্রণয়মূলক বিবাহের বিচ্ছেদ এত বেশী সংখ্যায় হইতেছে যে অশান্ত অতৃপ্ত নরনারী

সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গ একক জীবন যাপন করিতেছে । চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রেমের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত কেন ? কোথায় মানবপ্রেম ? জড়বাদী য়ুরোপ আমেরিকা প্রেমের মর্যাদা দিতে পারে না পারে ভারতবর্ষ — যেখানে বিবাহ দেওয়া হয় বিবাহ 'Sacrament' বিবাহের দ্বারা নরনারী সৃষ্টির পবিত্র সম্পর্কে যুক্ত হয় । এই বিবাহে বিবাহ পূর্ব প্রেম বা প্রণয় অনুপস্থিত — দেহের ও সাহচর্যের পথ বাহিয়াই প্রেমের জন্ম হয় — তখন পুরুষের বিবাহিত নারীই প্রেমসঙ্গিনী কামসঙ্গিনী সংসার সমুদ্রে সন্তানদাতা পত্নী । ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় ইহাই বিবাহের অর্থ । অন্নদাশংকরের উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে মতান্তর অনিবার্য । এই মতান্তর স্বাভাবিক - কারণ তিনি নরনারীর প্রেমকে **idealise** করিতে চাহিয়াছেন — উচ্চ ভাবলোকে যাহার বিহার । শেলীর 'স্কাইলার্ক'-এর মত আকাশচারী, 'শেষের কবিতায়' (১৯২৯ খ্রীঃ) অমিত-লাবণ্য প্রেম-সম্পর্কের মত প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এক আনন্দময় রসলোকে যেখানে নরনারী প্রেমের ভোরে রসাস্বাদন করিতে পারে — যাহা কোনোদিন বাস্তব জগতে প্রয়োজনের জন্য নয় । 'রত্ন ও শ্রীমতী'র প্রেম মানসলোকের প্রেম ।

'সত্যাসত্য' (১৯৩৮-৪২) রচনার সময় হইতেই 'রত্ন ও শ্রীমতী'র পরিকল্পনা লেখক মানসে উদয় হয় । মনে হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 'রত্ন ও শ্রীমতী' নামক দুরূহ উপন্যাস লিখিবার আন্তর প্রেরণা লাভ করেন । এই প্রেরণার বাস্তব-উৎস কী ? এর উৎস-মুখ কোথায় সে বিষয়ে স্থির কোন বিষয় জানা যায় না লেখক ও এ ব্যাপারে নীরব । প্রত্যেক উপন্যাস বা গল্পের জন্মসূত্রের ইঙ্গিত থাকা চাই । নতুবা স্রষ্টার মানস-প্রকৃতি ভাবনা ও চিন্তার সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব নয় । 'সত্যাসত্যের' ধারা-বাহী 'রত্ন ও শ্রীমতী' । উভয় গ্রন্থদ্বয়ে প্রত্যাসন্ন আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা মননধর্মী জটিল জীবন-বীক্ষা সবিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে — য়ুরোপীয় ভাবধারা হইতে সুরু করিয়া গান্ধীবাদ পর্যন্ত উপরন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মিক চেতনা কোনটিই বাদ যায় নাই । এই বিমিশ্র ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ায় বাদল-সুধী-উজ্জয়িনী (সত্যাসত্য) "রত্ন, শ্রীমতী"-তে (রত্ন ও শ্রীমতী) প্রেম ও ভালবাসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় মনে হয় মানবপ্রেমের সহিত নরনারীর প্রেম সমান অধিকার লাভ করিবে । প্রথা-সিদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় রক্ষণশীল মনোভাবের অপসারণ না হইলে প্রেমিক নর, প্রেমিকা নারীর বন্ধন-মোচন হইবে না যেমন বাদল কর্তৃক পরিত্যক্তা উজ্জয়িনী বাদলের জীবদ্দশায়

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে নাই, 'শ্রীমতী' রত্নর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা সত্ত্বেও যশোধর ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করিয়া ইবসেনের "ডলস্ হাউসের" নোরার মত রত্নর জীবন-সঙ্গিনী হইতে পারে নাই – সেখানেও ভারতীয় নারীর সহজাত সংস্কার ও মাতৃসুলভ নারীর "মহামায়ার মায়িক" রূপটি বা শক্তি শ্রীমতীর অন্তরের প্রেমকে পুত্র স্নেহে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করিতেছিল। নারী প্রকৃতির ইহা আর একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য। রত্ন ও শ্রীমতী উপন্যাসের ইহা মনে হয় আর একটি বিস্ময়কর দিক। এই উপন্যাসটি প্রেমতত্ত্বের উপন্যাস – সেই একই 'Life force' – একই সৃষ্টি-প্রবর্তনা, যাহা যুগে যুগে কালে কালে নানা 'ধর্ম' এ অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত কোথাও স্থূলভাবে কোথাও বা সূক্ষ্মভাবে আপন অব্যাহত অক্লান্ত গতির নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। উজ্জয়িনী (সত্যাসত্য) রত্ন, শ্রীমতী (রত্ন ও শ্রীমতী) সেই ধারার (সৃষ্টির প্রবর্তনা) একটি শক্তিশালী প্রবাহমাত্র। এই দৃষ্টিভংগী দ্বারা বিচার করিলে উপন্যাসদ্বয়ে নারীর প্রেম ও সৃষ্টি-প্রবর্তনা একত্র যুক্ত হইয়াছে – মানব-প্রকৃতির অধিকাংশই তো অন্তরনিহিত সৃষ্টি-প্রবর্তনার বহিঃপ্রকাশ আধুনিক বা অনাধুনিক উভয় চিন্তাধারায় ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্নদাশঙ্করের জীবনের প্রতি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই উপন্যাসদ্বয়ে সব রসের অবতারণা করিয়াছেন, মানব-মৈত্রী, নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক, সত্যের অন্বেষণ, রূপাভিসার, সামাজিক ন্যায়, বীরত্ব ইত্যাদি। রত্ন সম্মুখে শ্রীমতীর মনের কথা যাহা তাহা নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে গর্হিত। মন কি কখনো নীতির অধীন হয় বা হওয়া কি উচিত। তবে কল্যাণবাদীরা ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সমষ্টিগত কল্যাণ-ধর্মী মানসিক-শোধন ক্রিয়া সংযমের মাধ্যমে করিতে বলিয়াছেন - সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রীমতীর রত্নর প্রতি ভালোবাসাবাসি অসামাজিক। সাহিত্যের আসরে ইহাই জীবনের সত্য - 'গোটা মানুষের' ছবি – 'রিয়ালিটি'-র রহস্য উদ্‌ঘাটন।

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ~~[illegible]~~ তিনি সমাজ-পরিবেশে ব্যক্তিকে দেখেন না। ব্যক্তির নিজস্বতায় (চিরকালের মানুষকে খুঁজিয়াছেন) তাহার প্রেম-সাধনায় বিচার করিয়াছেন। 'বিশল্যকরণী' (১৯৬৬-৬৭), 'তৃষ্ণার জল' (১৯৬৭-৬৮), রত্ন ও শ্রীমতী (১ম ভাগ- ১৯৫৫ ; ২য় ভাগ ১৯৫৭, ৩য় ভাগ ১৯৭১) তাহার প্রমাণ। হারীত (বিশল্যকরণী), ও প্রবাহন (তৃষ্ণার জল) প্রেমকেই জীবনের মহত্তম উপলব্ধি বলিয়া মানিয়াছে। যদিও এই প্রেম পরমপুরুষার্থ নয়। হারীত ও প্রবাহন প্রেম-উপলব্ধির করিয়াছে বিভিন্ন স্তরের নারী চরিত্রের সাহচর্য্য ও সান্নিধ্য পাইয়া ও পার

হইয়া । প্রেমের উপলব্ধি তাঁহাদের কাছে পূর্ণতার উপলব্ধি - ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর-অনেকটা যেন ভাব-লোকে বিহারী দেহাশ্রিত অথচ স্থূল জগত হইতে সূক্ষ্ম জগতে দেহাতীত উপলব্ধি । এ প্রেম মানবীর জন্য নয়, হয়ত মানসীর জন্য যে মানসী সব নারীতেই 'Eternal Feminine principle' হইয়া রহিয়াছে । 'বকুল', 'পার্বতী' ভানস, সান্নিধ্যে 'হারীত', এবং 'সুদেষ্ণা (বিবাহিতা 'রাণী গোস্বামী'), 'কাজরী', 'হৈলেন'-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্যে প্রবাহন প্রেমের নানা দুর্জ্ঞেয় অর্ধালোকিত পথ পরিক্রমা করিয়াছে । "তারই জন্য আমি অপেক্ষা করতে চাই যে আমার তৃষ্ণার জল, আমি যার তৃষ্ণার জল" - প্রবাহনের এই উক্তিতে তাহার প্রেম সাধনা পরিস্ফুট হইয়াছে । কিন্তু প্রয়োজনের জগতে ইহা দুর্লভ তবে অসম্ভাবিত নয় । আমার মনে হয় 'তৃষ্ণার জল' ও 'বিশল্যকরণী' প্রেমের উপন্যাস নয়, প্রেমতত্ত্বের উপন্যাস । 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসে ওই একই মূল সুর ওই একই প্রেমতত্ত্ব একই অন্বেষণ । রত্ন আর শ্রীমতীর প্রেমের পথে নানা বিচিত্র রকমের বাধা মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, ইত্যাদি উপরন্তু ধর্মবোধ - পাপবোধের ভীতি । শ্রীমতী পরস্ত্রী — প্রধান বাধা রত্নর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া — তখনও রত্ন ও শ্রীমতী দ্বিতীয় ভাগ লিখিবার সময় ১৯৫৫-৫৭ হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হয় নাই, আর যে সময়ের কথা ও যুগ-পরিবেশের অবতারণা করা হইয়াছে সে সময় স্বাধীনতা লাভের পূর্বে গান্ধী-প্রভাবিত ভারতবর্ষে । তখন হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদ অকল্পনীয় ছিল । দ্বিতীয় বাধা- শ্রীমতী জননী । শ্রীমতী তাহার পুত্রের জনককে ভালবাসে না, কিন্তু পুত্রকে ভালবাসে । মনে হয় জননী শ্রীমতী পুত্রের মধ্যে নিজেকে বা রত্নর প্রতি প্রেমকে আরোপিত করিয়া নিজেকেই realise করে বা প্রেম-আস্বাদনের উচ্চস্তরের উপলব্ধি লাভ করে । মাতৃ-মূর্তি মহামায়ার মায়িক বন্ধন শ্রীমতীকে রত্নর প্রেমের উদ্দেশ্যে ঘরছাড়া করিতে দেয় না । রত্ন যে শ্রীমতীকে চায় সে শ্রীমতী কোথায় ? তাহার যে রূপান্তর হইয়াছে সে যে মূলত নারী - মাতৃরূপিনী মহামায়ারই মায়িক রূপ । নারী সম্বন্ধে ইহাই ভারতীয় অধ্যাত্মিক চেতনা । জড়বাদী য়ুরোপ একথা বিশ্বাস করে না । অতএব রত্নর প্রতি শ্রীমতীর প্রেম মানসলোকেই থাকিবে - রত্ন বুঝিতে পারিল এই সংসারে তাহার প্রেম সাধনা সার্থকতা পাইবে না ।

অন্নদাশঙ্কর জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধানী বলিয়া জীবনের ঘৃণিত কুৎসিত দিকটিকে 'বাস্তবতার' বাতিকগ্রস্ত হইয়া সাহিত্যের সামগ্রী করিতে তৎপর হইয়া উঠেন নাই । আধুনিক যুগের জীবনগত সমস্যা ও অভিজ্ঞতা তাহার রচনায় সীমা বাঁধিয়া উঠিয়াছে ।

এ যুগের মর্মকথাটি হইতেছে 'বন্ধন-মুক্তি' - 'অশান্ত', 'অস্থির' মানবাত্মার তথা নর-নারীর জীবন-যে জীবন তাঁহার উপন্যাসে, ভ্রমণ কাহিনীতে ও অন্যান্য রচনায় দেখা দিয়াছে । মানুষ যেন একালে যুরোপ ও আধুনিক ভারতবর্ষে কোথাও বাঁচিবার মত আদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছে না । — একটি চরম **disbelief** অবিশ্বাস দৃঢ়-প্রত্যয়ের অভাববোধ অক্টোপাশের মত ধীরে ধীরে জড়াইয়া ধরিতেছে — মানুষ এখন বড় একা বড় নিঃসঙ্গ, বড়ই দিশাহারা তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় । অন্নদাশঙ্করের রচনায় প্রমত্ত আধুনিক মানুষের কথা আছে । বিংশ শতকিয়া সভ্যতার যে চিত্রটি অধুনা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা কবির ভাষায় :

"There is
A network of railways, money, words,words, words,
Meals, papers, exchanges, debates,
Cinema, Wireless, the worst is marriage.
We can not sleep. A night we watch
A speaking clearness through cloudy paranoia".

বিজ্ঞান মানুষকে গতি ও দুর্জয় শক্তির অধিকারী করিয়াছে গতির চাঞ্চল্য দিয়াছে । তাই জীবনও গতিশীল - প্রগতিপন্থী ইহার আন্তর শক্তিও অপরিমেয় । ইহার বিচিত্র সম্ভাবনা ও পরিণতি অস্থাবিত নয় । তাই কোনো বিশেষ 'ফর্ম' আধুনিক মানুষের জীবনের নিয়ামক হইতে পারে না । 'বন্ধন-মুক্তি' তাহার একান্তই অনিবার্য প্রয়োজন — ইহা বাঁচিবার প্রেরণায়, অস্তিত্ব রক্ষা করিবার তাগিদেই । এই কারণেই সম্ভবত যুগ-ধর্মের প্রভাবে 'বিবাহ', নর-নারীর প্রেমের বিচিত্র সম্পর্ক প্রথা-সিদ্ধ সমাজ-স্বীকৃত ঐতিহ্যবাহী ধারার অবক্ষয় সম্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছে — ইহার পরীক্ষা পর্ব যেমন বর্তমান জীবনযাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তেমনি সাহিত্যেও তাহারই ছায়াপাত দুর্লক্ষ্য নয় । কোনো স্থির-প্রত্যয় বা আদর্শ বা জীবন-যাত্রার প্রেরণা-উৎস এখনও অনাবৃত । 'রত্ন ও শ্রীমতী' (১৯৫৫) প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯৫৭) সমাজ-নিরপেক্ষ প্রেম ও জীবনাদর্শের অন্বেষণ ব্যক্ত হইয়াছে । 'রত্ন ও শ্রীমতী'৭৫(১৯৭১) লিখিতে লেখক নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন । কারণ জীবনে সত্য ও সুন্দর খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন —

শিব তথা কল্যাণ-ধর্মটি অনায়ত্ত ছিল। শ্রীমতী (নারীর) প্রেমকে অনন্তের অভিমুখে প্রেরণ করিয়া রত্নকে শ্রীমতীকে পাঠককে পরিশেষে লেখক স্বীয় জীবনের সঙ্গে মানসলোকে একরকম রক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। জীবনের সত্য যাহা তাহা সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া পরম সত্যের সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়া পাঠক ও লেখক সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই রূপ ইঙ্গিতবহ পরিসমাপ্তি ভিন্ন রত্ন ও শ্রীমতী তৃতীয় ভাগ খাপছাড়া প্রেম-তত্ত্বের উপন্যাস হইত।

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের অন্তর্ভূমি নর-নারীর প্রেম ও যৌন-সম্পর্ক। একমাত্র ইহারই প্রবল আকর্ষণে পুরুষের জগৎ-সূত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নারীই তাহার অদৃষ্ট চক্রের প্রধান কীলক। তাহাতেই ঘূর্ণমান হইয়া তাহার দশান্তরের অবধি নাই। ...... প্রকৃতিরূপিনী নারীকেই পুরুষের জীবনের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুরূপে দক্ষিণা বা বামা মূর্তিতে - দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় - মনের গোপন লোকে। সর্বত্রই ওই কঠিন শিলাতটে পুরুষের পৌরুষ যে আছড়িয়া পড়িয়া তাহার শক্তির চরম পরীক্ষা দিতেছে। সেই পরীক্ষা যেন জীবনের আদি ও শেষ পরীক্ষা, সকল শ্রেষ্ঠ সাধনার সিদ্ধিলাভ যেন ঐখানেই বাঁধা আছে। প্রকৃতির এই বন্ধনও সত্য, পুরুষের পক্ষে ইহার অধীন হওয়াও তেমনি পুরুষোচিত। "রমনী ঈশ্বরের কৃতির চরম উৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র, স্ত্রী আলোক পুরুষ ছায়া।" যতক্ষণ সে দুর্বল ততক্ষণ সে ক্ষুদ্র মানবিক - ততক্ষণ ওই নারীর মায়াময়ী 'মায়া' — সেই মায়ার মহামায়ারূপ দেখিলেই, যখন এক নারীর প্রেম সব নারীতেই প্রত্যক্ষ করা যায় — 'বিশল্যকরণী' (১৯৬৬)-তে মালতী 'তৃষ্ণার জল' (১৯৬৭-৬৮)-এর প্রবাহন, রত্ন ও শ্রীমতী (১৯৭১ তৃতীয় ভাগ)-র র রত্ন ঐ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। মানব তখন সেই মহামায়ার অঙ্কশায়ী হইয়া শান্তং শিবং অবস্থার পরমানন্দ ভোগের অধিকারী হয়। আমার মনে হয় অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এই তত্ত্বটি নিহিত আছে।

শ্রীমতী নারী। তাই তাহার মহামায়ার মায়িক বা মায়াময়ী রূপ লেখক রত্ন ও শ্রীমতীর প্রত্যেক ভাগেই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইহার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় প্রবেশ না করিয়া ভারতীয় চিন্তাধারায় শিব-শক্তি-পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্বের আলোকে দেখিব। মায়াময়ী প্রেম-লিপ্সু শ্রীমতী বিবাহোত্তর জীবনে রত্নের সহিত প্রেম-সম্পর্কে মহামায়ার নানারূপেই দেখা দিয়াছে - কখনো 'রাখি-বন্ধন বহিন' রূপে কখনও বা মাধব-এর সঙ্গে একাকার রূপে কখনো বা আত্মার দোসর রূপে কখনো বা প্রেমিকারূপে — শেষ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী-

রূপে শিব-শক্তি রূপে বা পুরুষ-প্রকৃতির অনিবার্য আকর্ষণে । মায়াময়ী নারী শ্রীমতী মহামায়ারূপেই রত্নকে চায় স্বাধীনতার জন্য নয় ভালোবাসাবাসির জন্যে প্রেমের জন্যে ।" — রত্নকে শ্রীমতীর প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে ।"[৬৮] শ্রীমতীর আর এক সত্তা - মহামায়ার মায়াময়ী প্রেমময়ী সত্তা - ললিতের বিবাহ উপলক্ষে উৎসব ও শ্রীমতীর প্রতিক্রিয়া — "অর্থহীন উৎসব । সাবুর (ননদ সাবিত্রী) বর এলো, আমার বর এলো না । আমি কেন আনন্দ করব ।"[৬৯] আবার শ্রীমতী রত্নকে চিঠিতে লিখিয়াছে "তোমার পূর্ব জন্মের সঙ্গিনী গৌরী ।"[৭০] শ্রীমতীর প্রকৃতিরূপিনী সত্তা, সৃষ্টি-রহস্যের মূলতত্ত্ব — শ্রীমতী রত্নকে লিখিয়াছে — "আমার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অশান্ত অতৃপ্ত কামনা । এ নিয়ে আমি যাব কোন স্বর্গে ? আমাকে বাঁচতেই হবে । তা বলে কি আমি অনন্তকাল জ্বলব ? জ্বলতে পারে কেউ ? দগ্ধ হতে হতে আমার যৌবন গেল । জীবনও যাবে ? হৃদয় ভরা দাহ নিয়ে আমার রূপ কত কাল থাকবে ? তবে কি আমি পরাজিত হব ? পরাজয় মানব ?"[৭১] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডি.এইচ. লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' - উপন্যাসের 'কনি' গেমকিপার 'মেলরস' - এর সম্পর্কে ভোগে দৈহিক দিয়া যৌন তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, কারণ 'ক্লিফোর্ড' কনির বিবাহিত স্বামী যুদ্ধে যাওয়ার পর গৃহে ফিরিল কোমর হইতে নিম্নাঙ্গ Paralysed হইয়া । স্ত্রীর যৌন-পিপাসা নিবৃত্তি করিতে অক্ষম । শ্রীমতী উপন্যাসের ঘটনা চক্রে রত্নের দৈহিক উষ্ণতার সান্নিধ্যে আসিয়াছে । পর-স্ত্রী শ্রীমতীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা । রত্ন ও শ্রীমতী (= গৌরী) আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছে চুম্বন করিয়াছে — এই পর্যন্ত কিন্তু যৌন-সঙ্গম পর্যন্ত সম্পর্ক গড়াইয়া যায় নাই — লেখককে বাহবা দিতে হইবে কী অনিবার্য সংযম ও অক্লান্ত পদক্ষেপ করিয়া রত্ন ও শ্রীমতীর প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষা করাইয়া লইয়াছেন । রত্ন ধীরে ধীরে বুঝিল — "গৌরীর (শ্রীমতীর) প্রেম রাধার প্রেমের মত শুদ্ধ প্রেম । নিকষিত হেম ।"[৭২] গৌরী স্বাধীনতা চাহিয়াছিল — কিন্তু "যে স্বাধীনতার পেছে ভালোবাসা নেই সে স্বাধীনতা তার কোন কাজে লাগবে । সে তার প্রিয় পুরুষের [illegible] ঘরনী হতেই চেয়েছিল । স্বাধীনা হতে চায় নি । ঘরনী-ই হবে যদি তার প্রিয়তম পুরুষকে পায় ।"[৭৩] রত্নর কেমন যেন বোধ হইল - তাহার ভালমন্দ বিচার গেল । সুন্দর অসুন্দরের ব্যবধান দেখিয়াছে । সত্য ও অসত্য দেখিয়াছে । তাহার দ্বৈত দৃষ্টি দূর হইয়া গেল — অদ্বৈত দৃষ্টির অখণ্ড দৃষ্টির আলোকে সবই সত্য-শিব-সুন্দর ।

রত্ন শোরীকে (শ্রীমতী) লিখল – "তুমি আমার কান্তা । আমি তোমার কান্ত ।"[৭৪]

'রত্ন ও শ্রীমতী' প্রথম ভাগ (১৯৫৫-৫৬) পনেরো অধ্যায় পর্যন্ত । রত্নর শেষ পর্যন্ত প্রথম ভাগের শেষ অধ্যায়ে দেখি রত্নর পৌরুষ মহামায়ারূপিনী নারীর প্রেমের কঠিন শীলাতটে আছড়াইয়া পড়িয়া জীবনের চরম পরীক্ষা দিতেছে – নারীর প্রেমের কাছে শোরীর ভালোবাসার কাছে Surrender করিতেছে । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কত শক্তিতেই তিনি মানুষের মধ্যে লীলা করিতেছেন । কুষ্টিয়াতে (বর্তমান বাংলাদেশ) যখন রত্ন ছুটি কাটাইতে গিয়াছিল তখন আকস্মিকভাবে একটি ঘটনা ঘটে – অঘটন পটিয়সী মহামায়ারূপিনী নারী 'চণ্ডুরী' প্রকৃতির সৃষ্টির প্রবর্তনায় গভীর রাত্রিতে সবার অলক্ষে রত্নর শয়নঘরে প্রবেশ করে । চণ্ডুরী সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবী । যুবতী নারী । যৌবনের জ্বালা সর্বাঙ্গে স্তব্ধ হইয়া আছে । চোখের দৃষ্টিতে সৃষ্টির ও মিলনের ব্যগ্রতা । লেখকের বর্ণনা রত্ন সম্বন্ধে – "রত্ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে । চণ্ডুরীর চতুর হস্ত তার দেহ যন্ত্রকে আনন্দ লহরীর মতো বাজায় । সেখানে স্পন্দন জাগে । শিহরণ লাগে । পুরুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয় নারীর কেশ । সে ওকে বুকে টেনে নেয় ওর কোলে আপনাকে সঁপে দেয় । যা ঘটবার তা চকিতেই ঘটে যায় । সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ণ ঘটনা । একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ।"[৭৫] 'তারুণ্য' গ্রন্থখানি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত – ব্রহ্মচর্য ও নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তিনি দ্বিমত পোষণ করিতেন সংযম, ব্রহ্মচর্য - নারীর সতীত্ব স্বাভাবিক নয় – রত্নের চণ্ডুরী নামক নারীর সঙ্গে যৌন-মিলন কি প্রকৃতির নিয়মাধীন ? ইহাতে লজ্জা বা ঘৃণার কিছু নাই – অন্তত ইহাই প্রমাণিত হয় যে পুরুষ মহামায়ারূপিনী নারীর শক্তির কাছে কতই না দুর্বল ।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপের সমন্বয় কেমন করিয়া হইবে এই ভাবনা রত্নর - লেখকেরও ওই একই ভাবনা । রত্নর মধ্যে - "রিভাইভালিস্টের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করত এক মডার্নিস্ট । একজন যেমন অতীতের দিকে মুখ করে বসে আছে, আর একজন তেমনি পশ্চিমের দিকে চোখ মেলে । রত্নর মধ্যে দুটোই সমান প্রবল । অতীত মনস্কতা ও পশ্চিম মনস্কতা । প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় কেমন

করে হবে এটাই তার গভীরতর ভাবনা ।"[৭৬] অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসের প্রায় সব নায়ক-নায়িকার মধ্যে এই দোটানা মনোভাব কমবেশী বর্তমান বলিয়া মনে হয় ।

উপরিল্লিখিত উপন্যাসগুলিতে অন্নদাশঙ্কর নিজেকে বা নিজের মতামতের প্রক্ষেপ করিয়াছেন ফলে কাহিনী তাত্ত্বিক হইয়া উঠিয়াছে । রচনাগুলি অনেকাংশে দার্শনিক ভাবনার ফলশ্রুতি ।

উল্লেখ - পঞ্জী

১. 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ সবুজ-পত্র বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দ : রচনা কাল ১৩২১ বৈশাখ ।

২. সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৩. 'মোহনা' (উপন্যাস) পরিচয় পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮-৪৯ বঙ্গাব্দ : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩১৭ ডঃ সুকুমার সেন ।

৫. 'করুণা' : রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা কার্তিক ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ : লেখক কানাই সামন্ত ।

৬. নূতন ও পুরাতন - বক্তব্য পৃঃ ২৪৮ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

৭. নূতন ও পুরাতন - বক্তব্য পৃঃ ২৪৮ " " "

৮. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৪১৫ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৯. অন্তঃশীলা (উপন্যাস) ভূমিকা দ্রষ্টব্য : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

১০. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৪১৬ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১১. Hamlet : Shakespeare.

১২. অন্তঃশীলা (উপন্যাস) পৃঃ ১৬৬

১৩. The Technique of Modern English Novel (1959) : Sisir Chatterjee.

১৪. অন্তঃশীলা (উপন্যাস) প্রথম পরিচ্ছেদ : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

১৫. বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৮৬ (১৬): ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ।

১৬. শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বার বছর (Twelve Years with Sri Aurobindo) : নীরদবরণ

১৭. ঐ ঐ ঐ ঐ

১৮. ঐ ঐ ঐ ঐ

১৯. মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন : শ্রীঅরবিন্দ ।

২০. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য - পৃঃ ৪৪৪ ডঃ গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী ।

২১. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃঃ ৪১৩ : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২২. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪১৪ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২৩. মনের পরশ, রঙের পরশ, দোলা, বহুবল্লভ, দু'ধারা, তরঙ্গ রোধিবে কে ? – দিলীপ কুমার রায় ।

২৪. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য পৃঃ ৪৪৬ ডঃ গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী ।

২৫. সাহিত্যের মাত্রা, পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দিলীপ রায়কে লিখিত পত্র)

২৬. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৫১১ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২৭. **The Common Reader (1st series) 1956 Page 194-195 : Virginia Woolf.**

২৮. কণ্ঠস্বর - প্রবন্ধ-টলস্টয়, গান্ধী ও আমি পৃঃ ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

২৯. জাপানে (১৯৫৯) ভূমিকা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৩০. কণ্ঠস্বর (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) - প্রবন্ধ-লেখার কথা পৃঃ ১২-১৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৩১. জাপানে (১৯৫৯) পৃঃ ১২-১৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৩২. জাপানে (১৯৫৯) পৃঃ ৩৯ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৩৩. কণ্ঠস্বর (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৫ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৩৪. কণ্ঠস্বর (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৭ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৩৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৫০২ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৩৬. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৫০২ : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৩৭. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০২ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৩৮. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০২ ঐ ঐ ।

৩৯. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০২ ঐ ঐ ।

৪০.

৪০. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০২ ঐ ঐ ।

৪১. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০২ ঐ ঐ ।

৪২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৫০৩ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৪৩. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০৩ ঐ ঐ ।
৪৪. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০৩ ঐ ঐ ।
৪৫. জাপানে (১৯৫৯) - পৃঃ ৩৮-৩৯ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।
৪৬. ঐ ঐ ঐ ঐ ।
৪৭. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃঃ ৫০৩-৫০৪ : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৪৮. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৫০৩ ঐ ঐ
৪৯. সত্যাসত্য : অন্নদাশঙ্কর রায় ।
১ম খণ্ড যার যেথা দেশ (১৯৩২)
২য় খণ্ড অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩)
৩য় খণ্ড কলঙ্কবতী (১৯৩৪)
৪র্থ খণ্ড দুঃখমোচন (১৯৩৬)
৫ম খণ্ড মর্তের স্বর্গ (১৯৪০)
৬ষ্ঠ খণ্ড অপসরণ (১৯৪২)
৫০. বিনুর বই, দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ পৃঃ ৫৩৪ ।
৫১. তদেব - দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ পৃঃ ৫৬৭
৫২. প্রত্যাহৃত ভূমিকা : যার যেথা দেশ (৩য় সংস্করণ)
৫৩. তদেব ।
৫৪. দুই যুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য : পৃঃ ৪২৯- ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ।
৫৫. The Novel and the People : Ralph Fox
৫৬. সাহিত্যের যাত্রা : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪০ (শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে লিখিত পত্র)
৫৭. রত্ন ও শ্রীমতী (১ম ভাগ ১৯৫৫-৫৬) ভূমিকা অনুচ্ছেদ ২২, ২৩, ২৪ ।
৫৮. ঐ (ঐ) ঐ ঐ ২২, ২৩, ২৪ ।
৫৯. ঐ (ঐ) ভূমিকা অনুচ্ছেদ ২৪, ২৫ ।

৬০. রত্ন ও শ্রীমতী (১ম ভাগ ১৯৫৫-৫৬) ভূমিকা অনুচ্ছেদ ২৫, ২৬ ।

৬১. ঐ (ঐ) ঐ ঐ ২৭, ২৮, ২৯ ।

৬২. ঐ (ঐ) ঐ ঐ ২৪, ২৫

৬৩. কণ্ঠস্বর (১৯৫৬) পৃঃ ১৪৭-১৪৮ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৬৪. কণ্ঠস্বর (১৯৫৬) পৃঃ ১৪৩-১৪৭ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৬৫. কণ্ঠস্বর (১৯২৬) পৃঃ ২ : ঐ

৬৬. কণ্ঠস্বর (১৯৫৬) পৃঃ ১৪০ অনুচ্ছেদ ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় ।

৬৭. কণ্ঠস্বর (১৯৫৬) পৃঃ ১৪৪ অনুচ্ছেদ - ৩ : ঐ

৬৮. স্টীফেন স্পেন্ডারের কবিতা

৬৯. রত্ন ও শ্রীমতী (১ম ভাগ ১৯৫৫) পৃঃ ১৩৩ ঐ ।

৭০. রত্ন ও শ্রীমতী (ঐ) পৃঃ ১২১ ঐ ।

৭১. রত্ন ও শ্রীমতী (ঐ) পৃঃ ১২৫ ঐ ।

৭২. ঐ (ঐ) পৃঃ ১৫২ ঐ ।

৭৩. ঐ (ঐ) পৃঃ ১৫৩ ঐ ।

৭৪. ঐ (ঐ) পৃঃ ১৬৪ ঐ ।

৭৫. ঐ (তৃতীয় ভাগ - ১৯৭১) পৃঃ ২১৭ ঐ ।

৭৬. ঐ (ঐ) পৃঃ ১৯১ ঐ ।